গোলোকধাম

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

মুদ্রক
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রিট
কলকাতা ৬

বেলারানী গঙ্গোপাধ্যায়
সুখেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
বড় বৌদি ও বড়দাকে

রডন স্ট্রীটে অনেকগুলো নতুন বাড়ি উঠছে। দিন রাত পাইলিংয়ের আওয়াজ। আকাশ ফুঁড়ে পাইলিংয়ের কোণ উঠে গেছে দশতলা অব্দি। পাশের রাস্তাগুলো চওড়া হয়ে দু ধারে বেড়ে গেছে। তার ভেতর আগেকার গাছগুলো দাঁড়ানো। আগেকার ল্যাম্পপোস্ট এখনো পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

এরকমই ছুটো গাছের মাঝখানে একখানা সাইনবোর্ড। পুরনো একটা গেটের মাথায় ঝুলে আছে। গেটটা ভেঙে পিছিয়ে নেওয়া হবে সম্ভবত। তারই তোড়জোড় বোঝা যায়। সাইনবোর্ডে লেখা—রনি নার্সিং হোম।

বেলা দশটা হবে। তুঁতে রংয়ের একখানা ডবলু বি এফ নম্বরের অ্যামব্যাসাডর এসে থামলো। গাড়ি থেকে ছুটি মেয়ে নামলো। একজনের কাঁখে একটি কুকুরের বাচ্চা। তার গলায় চেন। বড় মেয়েটি বছর ষোল হবে। ছোটটি বছর বারো।

গাড়ি থেকে নেমে ছোট মেয়েটি বলল, মণিদা তুমি এস।

গাড়ি লক করে বেরিয়ে এল মণিদা। বছর উনিশের সদ্য যুবা। রোগা। পরনে হাতির কান ট্রাউজার। গাঢ় নীল রংয়ের। ওপরের দিকে টাইট লাল বুশ শার্ট। সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, খুশির গলার চেনটা খুলে দাও। বোস ডাক্তার দেখলে রাগারাগি করবেন—

গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে সিঁড়িতে ওঠার মুখে ওরা খুশির গলার চেন খুলে ফেলল। কম্পাউণ্ড ওয়ালের ভেতর প্রশস্ত উঠোন। চওড়া গাড়িবারান্দা থেকেই দেখা যায়—দোতলায় বড় কাচ-ঘরটার ওপর লেখা—ও-টি।

ভেতরে রিসেপসনে কোন বিলিতি ম্যাগাজিন থেকে কেটে নেওয়া কুকুরদের কার্টুনের ছবি—ফটো করে বাঁধানো। তিন-চারখানা। দেওয়াল জুড়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। একজন পুলিসের লোক একটি বড় কুকুরকে টেবিলের ওপর চিৎ করে রেখেছে। মোটা মত, বুশ শার্ট গায়ে এক ভদ্রলোক—স্টেথিসকোপ দিয়ে কুকুরটার হার্টের আওয়াজ শুনছিলেন মন দিয়ে। ওদের তিনজনকে দেখে চোখের ইশারায় বসতে বললেন।

পুলিসের লোকটি কুকুর নিয়ে চলে যেতে সেই মোটা মত লোকটি বলল, ওকে চেনো ?

না তো।

ওর নাম বেকি। পুলিসের কুকুর। কাগজে ছবি দেখে থাকবে। তারপর লোকটি ছোট মেয়েটিকে বলল, কি হয়েছে ওর ললি ?

ললি এগিয়ে গেল খুশিকে নিয়ে। দেখুন ডাক্তারবাবু। খুশি কিছু খাচ্ছে না।

কেন ? দেখি। বলে ডাক্তারবাবু খুশির নাকে হাত বোলালেন। হুঁ। এ যে দেখছি জ্বর হয়েছে। নাক একদম শুকনো। বলতে বলতে ডাক্তার বোস খুশির পেছনের পায়ের ভেতরের দিকে পেটে হাত রাখলেন। ঠাণ্ডা লেগেছে ?

কলতলায় গিয়ে শুয়ে থাকে।

ব্রংকাইটিস হয়ে যেতে পারে। স্টুল এগজামিনেশন রিপোর্ট এনেছো ?

ভুলে গেছি ডাক্তারবাবু।

কত নম্বর ছিল বল তো ?

মলি ললির দিকে তাকালো। ললি মাটির দিকে। মণি কিছু না বুঝে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকালো।

নম্বরটাও মনে নেই তোমাদের ? এই বুঝি কুকুরকে ভালবাসো ! ছিঃ ছিঃ !

কার্ডখানা আনতে ভুলে গেছি ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বোস রেজিস্টারের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। টেপ ক্রিমির ইঞ্জেকশন দিতে এনেছিলে কবে? মনে আছে? তার দু হপ্তা আগে স্টুল এগজামিন করেছিলাম। এইজন্যে পই পই করে বলি—দেখানোর সময় কার্ড আনবে সঙ্গে।

ঠিক এই সময় রনি নার্সিং হোমের ভেতর থেকে প্রায় দশটা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠলো।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন, তোমরা বোসো। আবার সেই রঙের কারখানা থেকে গন্ধ আসছে নিশ্চয়। আমার হস্টেলের কুকুরগুলো এ গন্ধটা একদম সহ্য করতে পারে না।

ডাক্তার বোস ভেতরে চলে গেলেন—পাশের বড় দরজা দিয়ে।

তার পেছন পেছন মণিও চলে গেল। ললি দুবার ডাকলো, এই মণিদা! মণিদা! যেও না। মলি ডাকলো এই মণি—যেও না! কুকুর ছাড়া থাকতে পারে।

মণি কিন্তু চলে গেল। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মলি বলল, কানে যদি একটু শোনে। একদম কালা।

মণি তখন মন দিয়ে দেখছিল ভেতরের দিকটা। ঠিক ঘর নয়। হল ঘর। বেশ বড়। দেওয়াল জুড়ে জানলা। তার পাশে কাঠের বড় বড় খাঁচা। এক একটি খাঁচায় এক একটি যমদূত বসে। লাল চোখ। মোটা লেজ। পায়চারি করার মত খানিকটা জায়গা ভেতরে। অন্তত তিরিশটা খাঁচায় তিরিশটা কুকুর—বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে। তারা সবাই সন্দেহের চোখে মণিকে দেখলো।

ডাক্তার বোস গিয়ে তিন তিনটে জানলা বন্ধ করে দিলেন। অমনি কুকুররা শান্ত। অনেকেরই খাবার থালায় তখনো হাড়ের বড় টুকরো। ঘর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে দেখে ডাক্তার মণিকে বললেন, ওই সুইচটা অন করে দাও তো।

সুইচ টিপেই মণি অবাক। ঘরের ভেতরখানা দিনের আলো পেয়ে যেন ঝকঝাক করে উঠলো। তখন ডাক্তার বোস ছাড়া দাঁড়ানো পাখাকে

পা এগিয়ে সুইচ টিপলেন পর পর। মণি বুঝলো ভুঁড়ির জন্যে ডাক্তারবাবু নিচু হতে পারেন না। নইলে কেউ পা দিয়ে পাখা চালায়?

বড় ব্লেডের তুই পাখা ঘরের ভেতর ঝড় এনে দিল। তার ভেতর গোটা তিনেক কুকুর খাঁচায় বসে জিভ ঝুলিয়ে দিল—আর হ্যা হ্যা করে হাওয়া খেতে লাগলো।

ডাক্তারবাবু ফিরে এসে বসতেই ললি বলল, মনে পড়েছে। এগারোশো সাতান্ন। আপনি খাতা খুলে দেখুন। আমার স্কুলে ফার্স্ট টার্মিনালের সময় খুশিকে প্রথম আপনি ইঞ্জেকশন দেন।

কি করে মনে পড়লো?

আপনার হস্টেলের কুকুররা ডেকে উঠতেই মনে পড়ল।

গুড। তারপর খাতা খুলে দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবু বললেন, পেয়েছি। খুশি সেন। ওর মায়ের নাম তো লিসা। মোনালিসা। মোনালিসার বাবাকে একসময় আমি চিকিৎসা করেছি। মনে পড়েছে। খুশির দাতুর টিউমার হয়েছিল। আমাদের এখানেই অপারেশন করেছি। তখন রনি নার্সিং হোমে এত বড় হস্টেল ছিল না। আমি সবে ক' বছর হল চেম্বার খুলেছি—

বলতে বলতে ডাক্তার বোসের খেয়াল হলো, এসব কথা তিনি কাদের বলছেন। একজন সিক্স সেভেনে পড়ে। আরেকজন যদিও লিপস্টিক লাগিয়েছে—শাড়ি পড়েছে তবু স্কুলের গণ্ডি বোধহয় পেরোয়-নি। মেয়েটার 'অ্যানিমালে' প্রীতি আছে। ছোকরা ছেলেটি সম্ভবত ড্রাইভার। তবে বেশ—সরল সিধে। ডাক্তার মণির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলো,—ছেলেটা চালিয়াৎ নয়।

ললি বলল, খুশিকে ডাক্তারবাবু আপনার হোস্টেলে রাখুন কিছুদিন, এত অসভ্য। একটা যদি কথা শোনে। দিদি পড়তে বসলে—দিদির সায়া চিবোবে।

দিদিকে বেলবটস পরতে বল। আমি তো হোস্টেলে এমনি রাখি নে। ধর তোমরা কলকাতার বাইরে গেলে। তখন কে দেখবে খুশিকে? সেসব

সময় আমার এখানে রেখে যেতে পারো। বিলেত থেকে যখন পাস করে ফিরলাম—তখন দেখি কলকাতা শহরটাই অসভ্য। নিজেরা আরামে থাকবে সবাই। আর কুকুর হলে তো কথা নেই। যত পারো অযত্ন করো। কোন ম্যানার্স জানতো না শহরটা। আমি এসে সভ্য করলাম।

মণি সব শুনতে পাচ্ছিল না। ডাক্তারবাবুর ঠোঁট নাড়া লক্ষ্য করে আন্দাজে সব শুনছিল। আর বুঝতে পেরে চমকে চমকে উঠছিল। কি সর্বনাশ! এই লোকটা কুকুরের চিকিৎসে শিখতে বিলেত গিয়েছিল? শিখে এসে এই এত বড় হাসপাতাল। হস্টেল। অপারেশন। ইঞ্জেকশন। ভিজিট।

ডাক্তারবাবুকে যত দেখছিল—ততই ভক্তি বেড়ে যাচ্ছিল দুই বোনের। অতগুলো বড় কুকুরের কোরাস একসঙ্গে শুনে খুশি যে অমন কুঁচকে গিয়ে মেঝেতে চুপটি করে পড়ে আছে সেই থেকে—যাকে কিনা মা দেখলেই গলা মোটা করে বলবে—খুশি। বিছানা থেকে নামো—ও—ও—সেই খুশি যে সামান্য একটা কুকুর নয়—তারও ইঞ্জেকশন আছে, কোনদিন অপারেশন হতে পারে এখানে, স্টুল এগজামিনেশন হয়—জ্বর হয়—রনি নার্সিং হোমে না এলে—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ না হলে তারা তো জানতেই পারতো না।

দেওয়ালে দেওয়ালে কুকুরদের ছবি। ঘেরা কম্পাউণ্ড ওয়াল। এসব জিনিস পড়তে ডাক্তারবাবু বিলেত গিয়েছিলেন—তার সার্টিফিকেটও দেওয়ালে ফটো করে বাঁধানো।

ডাক্তার বোস খাতা দেখতে দেখতেই বললেন, খুশির তো এখনো টেপ ক্রিমি আছে। কোন্ দোকান থেকে মাংস কেনো?

মণিদা বল তো।

মণি ভড়কে গিয়ে বলল, মাংস না তো। কিমা এনে দি রোজ। এক শো গ্রাম করে। মুন্নার দোকানের—

তাই তো দেবে। এখন বড় মাংস দিলে কনস্টিপেশন হবে। কাছে আনো। ইঞ্জেকশন দেব।

খুশি সবই বুঝতে পারছিল। এই জায়গাটা তার ভালো লাগে না। এলেই ফোঁড়াফুঁড়ি। চারদিকে সবাই তার চেয়ে বড়। এমন কি তার মত দেখতে যারা—তারাও।

মণি খুশিকে ধরে ছিল। খুশি চেঁচাচ্ছিল। পেছনের পায়ের উপর ডাক্তারবাবু ছুঁচ বসিয়ে দিতেই খুশি চেঁচিয়ে উঠলো। মণির চোখে জল এসে গেল। তারও ক্রিমি ছিল ছোট বেলায়। মা ন্যায়রত্ন লেনের এক বাড়ির উঠোন থেকে পাথরকুচি পাতা এনে বেটে রস করে খাওয়াতো তাকে। হয়তো সারেনি। ক্রিমির জন্যেই হয়তো সে এত রোগা। ইঞ্জেকশন না নিয়েও তো বেঁচে আছে। মলিদির যত বাড়াবাড়ি। এতটুকু কুকুরকে কেউ ব্যথা দেয়। দু মাসও হয়নি। দুধের বাচ্চা।

সিরিঞ্জ স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে ডাক্তারবাবু তুলো মুড়ে একটা বাক্সে রাখলেন। তারপর খস খস করে লিখে কাগজখানা মলির হাতে দিলেন। বনিসন চার ফোঁটা—খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে দুবেলা। দুধের সঙ্গে দেবে অস্ট্যোক্যালসিয়াম। এখন বাড়ি নিয়ে গিয়ে দু' ঘণ্টার ভেতর কিছু খেতে দেবে না। বমি করে যেন বমি না খেয়ে ফেলে। লক্ষ্য রাখবে।

সবে মে মাস। এখনই গরমের কি হয়েছে! খুশি জিভ ঝুলিয়ে হ্যা হ্যা আরম্ভ করে দিল। বোস ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভিজে কাপড়ে গা মুছিয়ে দেবে মাঝে মাঝে। হপ্তায় একদিন চান করিয়ে গা ব্রাশ করে দিও। কানে যেন জল না যায়। হাড় মোটা করবার ওষুধ দিয়েছি আজ। গায়ে পোকা দেখলে আমায় টেলিফোন করবে—

মলি সাহস করে বলল, আপনি বলেছিলেন—ওকে ডগ শোয়ে নামাবেন।

আরেকটু বড় হোক। আমার রানির কথা বলেছি তোমাদের?

ললি বলল, ছবি দেখিয়েছিলেন।

ওর যখন এক বছর বয়স—তখনই আমার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ট্র্যাফিক সিগন্যাল সবুজ দেখলে দাঁড়িয়ে

যেত। গাড়ি পাস করলে লাল হলো। তখন ও রাস্তা ক্রশ করতো। দু' বছর বয়সে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে রেগুলার শোয়ে আর্টিস্ট। কি একটা নাটক চলছিল তখন। বৃহস্পতিবার নুন শো। শনি রবি ডবল শো। দুপুরের পর থেকেই উসখুশ করতো। কখন থিয়েটারের গাড়ি এসে নিয়ে যাবে ওকে—

ললি বলতে যাচ্ছিল—রনি কোথায়?

তার আগেই মলি চোখের ইশারায় ছোট বোনকে থামালো। সেই চোখ দিয়েই দেওয়ালে টাঙানো রনির রঙিন ফটো দেখালো। লাল জিভ। কালো গলা। বাঘের থাবা দুই পা এখনো ক্যামেরার দিকে।

বাড়িতে বেড়াল আছে কিনা বোস ডাক্তার জানতে চাইলেন। শেষে বললেন, থাকলে কিন্তু বেড়ালের পোকা বাতাসে উড়ে এসে ওর গায়ে বসবে।

আগে ছিল। ও আসতেই পালিয়েছে। এখন তিনটে হুলো প্রায়ই কার্নিসে বসে একসঙ্গে কোরাস গায়—

বোস ডাক্তার বললেন, বিকেলের দিকে তো?

মলি আর ললি একসঙ্গে মাথা নাড়লো। সন্ধ্যের দিকে—

ওই হলো। কোরাস নয়। হুলো তিনটের গ্যাস্টিক পেন ওটে। মেডিসিন দিলে কমে যেত। ধরে আনতে পারো।

মণি হেসে বলল, দিদিরা সে ধরবে কি করে! ধরতে গেলে পালায় আর কার্নিসের এমন জায়গায় বসে গান ধরে—কে ওদের ধরবে সেখান থেকে। ধরতে গেলেই পা পিছলে পড়তে হবে নিচে—

ছাখো তা হলে এই তো আমরা মানুষ! পাশাপাশি থাকি—অথচ ভাব নেই কোন। আমাদের কোন উপকার বেড়াল তিনটে নেবে না। বিশ্বাস করে না আমাদের। ছাখো গিয়ে কত লাথি মেরেছি আমরা—

মলির মনে পড়ে গেল। সে একবার একটা হুলোকে লাথি মেরেছিল। তাই চুপ করে গিয়ে ভিজিট আর ইঞ্জেকশনের জন্যে একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল।

পকেটে রেখে দিয়ে বোস ডাক্তার বললেন, গতবারের ভিজিটটা ?

আর নেই ডাক্তারবাবু—

কেন ? তোমাদের বাবা দেননি ?

বাবা তো বাড়িই নেই ক'দিন। কখন ফেরে—কখন বেরিয়ে যায়—আমরা দেখতে পাই নে।

বোস ডাক্তার রেজিস্টার খুলে এগারোশো সাতান্ন নম্বর দেখছিলেন। ওনাব কলমে লেখা—রঙ্গলাল সেন। তারপর ঠিকানা। ফোন নম্বর।

মায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনবে। খুশিকে তো ডিসটেম্পারের ইঞ্জেকশন দিতে হবে ক'দিন বাদে—

মাকে এ মাসে টাকা দেয়নি বাবা। নিজেই সংসার চালাবে ঠিক করেছে—

সে কি কথা ? তোমার বাবা তো কি যেন একটা কাগজ চালান। তারপর আবার সংসার ! কি ভাবলেন বোস ডাক্তার। হাতে টাকা না থাকলেও দরকার হলেই ফোন করবে। এই সময়টা ওদের একটু সাবধানে রাখতে হয়।

পার্ক স্ট্রীট দিয়ে গাড়ি গান্ধী স্ট্যাচুর মুখোমুখি হতেই মলি বলল, ময়দান দিয়ে চলো। খুশি একটু হাওয়া খাবে।

ললি ফিরে দেখলো, খুশি—খুশিটি হয়ে তার দিদির কাঁধে। মুখখানা গাড়ির পেছন দিকে। পাতাল রেলের গোডাউনের ছাদ সবুজ লতা উঠে ঢেকে ফেলেছে। গরুর পাল। পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক।

মণি দুটো মিনিবাসকে অপমান করলো প্রথম। তারপর একখানা বিলিতি গাড়িকে। সবাইকে ওভারটেক করে এগোচ্ছিল। মলি দেখলো, স্পিডের কাঁটা সত্তর কিলোমিটারে কাঁপছে। সামনের উইণ্ড-স্ক্রিনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল খুব জোরে ছুটে আসছিল। আরেকটু এগোলেই এস এস কে এম হাসপাতাল। ডান হাতে রেসকোর্স।

ললি বললো, মণিদা আস্তে চালাও। তাড়া কিসের—

মণি—মণিলাল ব্যানার্জী ললির কথা শুনতে পায়। স্টিয়ারিংয়ে

চোখ রেখে বলল, স্কুল আছে না তোমাদের। বৌদি শেষে রাগ করবে।

মলি ধমকে উঠলো। সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। আস্তে চালা। দাদাবাবুর এই মেয়েটির সঙ্গে তার ভাব নেই। কথায় কথায় বেঁধে যায়। একদিন নবমীর রাতে তাকে নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়েছিল মলিদি। প্রিয়া সিনেমার ওখান থেকে মলিদি তিনটে ছেলেকে গাড়িতে তুলে লেকে গিয়েছিল। মণিকে দিয়ে এক টাকার চিনেবাদাম কিনিয়েছিল তখন। মণি ঠিক করলো, সব একদিন বলে দেবে দাদাবাবুকে। মলিদির কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মণি আরও জোরে চালাতে লাগলো। আরও কয়েকটা গাড়িকে অপমান করলো। তারা সবাই এক সঙ্গে গজরাতে গজরাতে এই ডবলু বি এফ গাড়িটার পেছন পেছন ছুটে আসছিল। খুশি হা করে হাওয়া খাচ্ছে। তার পাছায় ইঞ্জেকশনের ব্যথা। মলি সেখানটায় সাবধানে হাত রেখেছে।

মণি হঠাৎ স্পিড কমিয়ে আনায়, খুশি সমেত দু বোনই চমকে উঠলো। কি ব্যাপার মণিদা? তেল ফুরিয়ে গেল? আমাদের হাতে আর টাকা নেই কিন্তু।

ললিকে থামিয়ে মলি বলল, টাকা থাকলেও তো পেট্রোল পাম্প নেই এখানে। গাড়ি ঠেলবার লোকও পাওয়া যাবে না এখানে—

মণিলাল পিচ রাস্তা থেকে সরে ঘাসের ওপর গাড়ি দাঁড় করালো। মুখে হাসি।

মলি খিঁচিয়ে উঠলো। হাসছিস কেন কালা?

মণিলাল কোন জবাব না দিয়ে আরও হাসতে লাগলো। সে ট্যাক্সি ধুয়ে—গ্যারেজে ব্যাক করে রাখতে রাখতে গাড়ি চালানো শিখেছে। তার লাইসেন্সের বয়স মোটে বছর খানেক। এত অল্পে মণিলালের চলে যায় যে কি বলবে সে। বড় বড় বাড়ির কত ভালো গাড়ি-বারান্দা আছে এই কলকাতায়। তবু যে কেন লোকে বাড়ির জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। সে তো দিব্যি ওইসব জায়গায় শুয়ে শুয়ে বড় হয়েছে।

হাসছিস কেন ?

ওই ছাখো মলিদি—

মণি আঙুল দিয়ে কি দেখালো। সেদিকে তাকিয়ে তু বোন কিছুই দেখতে পেল না। কতকগুলো গরু চরে বেড়াচ্ছে। আরেকটু দূরে একপাল পাঁঠা-খাসি। কসাইয়ের পাহারাদার তিনজন হাতে ছড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল।

কি ? খুলে বল না—

ওই তো। ভালো করে দেখো। তোমাদের বাবা—

তু বোন একসঙ্গে সোজা হয়ে বসলো। সত্যিই তো। তাদেরই বাবা। রঙ্গলাল সেন। সকাল সকাল অফিসে বেরিয়ে ময়দানে এসে কি করছে ? মলির মনটা টন টন করে উঠলো। সে শুনেছে—লোকে প্রেম করতে—হাত ধরাধরি করে বেড়াতে ময়দানে আসে। বাবাও কি তাহলে কোন বান্ধবী জুটিয়েছে ? মাকে লুকিয়ে এখানে দেখা করতে আসে—

খুশিকে ধর বলে মলি মণির হাতে গছিয়ে দিল। তারপর দরজা খুলে সটান মাঠে। বাঁশ আর খুঁটি পুঁতে লোকজন একটা মঞ্চ বানাচ্ছে। তু'ধারে বাঁশের খুঁটি পুঁতে ভিড় সামলাবার রেলিং বানানো হয়েছে। দূরে তার ভেতর দিয়ে রঙ্গলাল সেন হেঁটে আসছিল।

বাবাকে দেখে মলির খুব গর্বও হলো। বাবা এখনো খুব ইয়ং দেখতে। তাঁর হেঁটে আসা দেখতে পেয়ে মণির কোল থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়ল খুশি। বেলা এগরোটা হবে। বাতাস দিচ্ছিল গঙ্গা থেকে। রাস্তায় ফুল স্পীডের রঙিন সব গাড়ি।

খুশিকে তুর তুর করে দৌড়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো রঙ্গলাল। তারপর চোখ তুলে মেয়েদের দেখে বলল, তোরা ? কোত্থেকে ?

ললি এগিয়ে গেল। অফিসে যাবার নাম করে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

মলি কোন কথা বলল না প্রথমে। তারপর বলল, এজন্যে তুমি আজকাল গাড়ি নাও না সঙ্গে।

কি জন্যে?

কোথায় কোথায় ঘোরো—তা লুকিয়ে রাখতে চাও তো বাবা।

পাকামি করিস নে। ওঠ্‌, গাড়িতে।

চলন্ত গাড়িতে বসে ললি বলল, তুমি এখানে কি করছিলে বাবা?

কাল মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছে। নতুন সরকার এখন। চিফ মিনিস্টার ওই মঞ্চ থেকে কাল বিকেলে বক্তৃতা দেবেন।

তা আজ সকালে তুমি কি করছিলে? ফাঁকা মাঠে? কাল তো বক্তৃতা। সে তো রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার আসবে। তুমি কেন একদিন আগে মাঠে এসে বসে আছো?

সব কি তোরা বুঝবি। পড়িস তো স্কুলে। এর ভেতর থেকেও তো খবর হতে পারে। খুশির খবর কি?

জ্বর হয়েছে।

তাহলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বর্লি করতে বল্‌। মণি আমায় একটু নামিয়ে দিবি বাবা। প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে।

তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি না বাবা।

না। আমি একটু ঘুরবো। একা একা। রাস্তায় রাস্তায়।

আমরাও তোমার সঙ্গে ঘুরবো। মণি খুশিকে বাড়ি নিয়ে যাক।

না। আমি একা ঘুরবো। অনেকদিন ঘুরি না। একা ঘোরা হয় না আর কি।

ললি তার দিদিকে বলল, ছেড়ে দে বাবাকে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। শেষের এই ডায়লগটা ওদের মায়ের। শুনেও শুনলো না রঙ্গলাল।

২

বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল ডান হাতে। সামনেই থিয়েটার রোড্। রঙ্গলাল সেন বড় বড় বাড়ির ছায়া ধরে হাঁটতে লাগলো—তার একটা রেস্তোরাঁয় বসা দরকার।

যে রেস্তোরাঁয় সাধারণ লোক আসে। এসে এক কাপ চা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলে। রাজা-উজির মারে। আর দেখা দরকার—সেই সাধারণ খদ্দের চায়ের কাপটি নিয়ে কোন্ কাগজ পড়ে—কোন্ কাগজের কোন্ খবরটা নিয়ে মাথা ঘামায়।

রঙ্গলাল সেন। বয়স চুয়াল্লিশ। হাইট পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। ওজন—? সেইটেই তার ইদানীংকার মুশকিল। বাড়তে বাড়তে এখন পঁচাশি কে. জি.।

এত মোটা রঙ্গলাল ছিল না। তার পঁচিশ বছর আগেকার একখানা ছবি আছে। ছবিখানাকে তার এখন মনে হয় গতজন্মের। বেলা এগারোটার কলকাতা। হাঁটছিল আর ঘামছিল। অথচ এই রঙ্গলাল জীবনের প্রথম উনচল্লিশ বছর শুধু হেঁটেছে। ট্রামে বাসে বাদুড়-ঝুলেছে। কাগজের অফিস থেকে কাজ সেরে লাস্ট ট্রামে কিংবা পায়ে হেঁটে রাস্তা ভেঙেছে।

এখনো ভাঙছিলো। মাথার ওপরে একটা গনগনে সূর্য।

রঙ্গলাল একটা বিষয়ে একদিন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ছিল। বিষয়টার নাম কলকাতা। ট্যাংরা থেকে সালকে। বরানগর থেকে বাটা। সবক'টা রেস্তোরাঁ তার চেনা ছিল। কোথায় সস্তার হোটেল—কোথায় হাঁটতে হাঁটতে খিদে পেলে কচুরি পাওয়া যায়—কোথায় চপের ভেতর তেঁতুল দেয়—সবই তার জানা ছিল। ভবানীপুরে—যেখানটায় মোটরগাড়ির বডির কাজ হয়—আর হয় প্লাম্বিংয়ের কাজ—সেখানটায় এই শহরের

সবচেয়ে বড় জিলিপি আর সিঙ্গাড়া সবচেয়ে সস্তায় পাওয়া যেত। সে ছিল কলকাতার আদি পরিব্রাজক। পায়ে হেঁটে হেঁটে সব জেনেছিল একদা।

জানতে হয়েছিল তাকে। কারণ, খুব সামান্য।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই দেখা যাচ্ছিল—বালক রঙ্গলাল খুবই সাধারণ। কোন প্রতিভার চিহ্ন তার ভেতর তখন দেখা যায়নি। আর পাঁচজন বাঙালী যুবকের মতই সে গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে কাগজে এসে পড়ে। বেশ অল্প বয়েসে। প্রথম তিন বছর নিউজপ্রিণ্টের গোডাউনে গোডাউন ক্লার্ক। চার বছর ছিল টেণ্ডারের বিজ্ঞাপনের প্রুফ-রিডার। তারপর একটা দুটো লিখে লিখে সে নজরে আসে। প্রথমে বাজার দর। দুবছর। তারপর কলা-সমালোচক। কিছুদিন করপোরেশন। ততদিন রঙ্গলাল সেন ভাল টেলিপ্রিণ্টার ওয়াচার। নিউজ এজেন্সির সাধারণ খবর থেকে চটকদার খবর করতো সে। রাত ডিউটিতে যা মন দিয়ে লিখতো—সকালবেলা ট্রামে ফেরার পথে পাবলিককে তা মন দিয়ে পড়তে দেখে—তার ভালো লাগতো।

একবার প্রধানমন্ত্রী কাভার করার সময় দেখা গেল—রঙ্গলালের খবরাখবর লোকে পড়ছে। উনিশ বছর চাকরির মাথায় দেখলো—রঙ্গলাল নিজে একজন রেসপেকটেবল লোক হয়ে উঠেছে।

রেসপনসিবল হতে মন্দ লাগে না। কিন্তু রেসপেকটেবল হয়ে উঠতেই তার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠলো। আমি তো আসলে নীলবর্ণ শৃগাল। নীল মেশানো ধোপার গামলায় পড়ে গিয়েছিলাম। বৃষ্টিতে যেদিন রঙটা ধুয়ে যাবে? সেদিন?

এসব ভাবতে ভাবতেই একদিন রঙ্গলাল টের পেল—সে একখানা গাড়ির ব্যাক-সিটে বসে অফিসে যাচ্ছে। রাস্তায় অনেক লোক বাস ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে। গরম। তার নিজের কোন কষ্ট হচ্ছে না। সেদিনই সে জানতে পারে—এর নাম ভালগার।

অথচ সে নিজে একদা বাসের দরজা পাল্টে পাল্টে টিকিট ফাঁকি

দিয়েছে। কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতেই ঠাণ্ডা গলায় বলেছে—মান্থলি। লোকাল ট্রেনে মোবাইল চেকের দরুন শেওড়াফুলিতে সে একবার ধরা পড়ে।

কাঠগোলার এক মালিকের ছেলেকে সে একসময় মেড ইজি দেখে পড়াতো। হাঁটতে হাঁটতে রঙ্গলালের মনে পড়ল, সে একসময় পুরনো আধুলি ট্রাম লাইনে পেতে রেখে পাতলা পাতলা টাকা বানিয়েছিল। সিনেমার কাউন্টারে সেই টাকায় বন্ধুবর্গ নিয়ে টিকিট কাটতে গিয়ে হই-হই।

ভদ্রলোক হতে তার এত অস্বস্তি। রঙ্গলাল হাঁটছিল আর খুব নিচু গলায় বলছিল, আমি লোফার। আমি জাত-লোফার। তার পায়ের কাবলি জুতো থেকে তালে তালে শব্দে যে কথাটা উঠে আসছিল—তা শুনতে অনেকটা—আমি নিইচি—তুই দেকেচিস? সেই তালে রঙ্গলাল সেন বলে যাচ্ছিল—আমি লোফার। আমি জাত-লোফার।

গত পাঁচ বছর ধরে পুরোদস্তুর ভদ্রলোক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ে ব্যথা। গাল ভারি। চোখ ফোলা ফোলা। খানিকটা ভেসে ওঠা ভাবও আছে। গত বছর বুকে একটা ব্যথা ওঠায় অফিস থেকেই রঙ্গলালকে চেকআপ-এ পাঠায়। সেখানেই সবটা ধরা পড়ে।

শরীরের একটা গ্ল্যাণ্ড থেকে ঠিকমত জুস ঝরছে না। তাই একখানা বিস্কুট খেলেও তা ফ্যাট হয়ে যাবে। ভ্রূ পড়ে যেতে থাকবে। বিকেল পড়লে শরীরে শীত আসতে চাইবে। কেউ থ্যাংকয়ু বললে হাত বাড়াতে দেরি হয়ে যাবে। অজান্তেই ওজন বাড়তে থাকবে। বুক ঢিপ ঢিপ বন্ধ হবে না। পা ফুলতে পারে।

ডাক্তার বলেছিল, পুষ্টিকর খাদ্য পারতপক্ষে এড়িয়ে চলবেন।

রঙ্গলাল জানতে চেয়েছিল—তবে কি খেয়ে থাকবো ডাক্তারবাবু?

ছাইপাঁশ। ছাইপাঁশ খেয়ে কাটাবেন। নয়তো আপনার ওজন এক কুইন্টাল হয়ে যাবে একদিন।

সওয়া বারোটা নাগাদ পছন্দমত একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে গেল রঙ্গলাল।

ফ্রেণ্ডস্ কেবিন। এ রেস্তোরাঁ তার চেনা। বাইশ বছর আগে নাম ছিল প্যারাডাইস। এদিককার সব রেস্তোরাঁর মালিক তাকে চিনতো। রঙ্গলালের চেষ্টাতেই এ-পাড়ায় কাপড়ের দোকান হয়েছে। পর পর পাঁচটা চায়ের দোকানে সদলে বাকি খেয়ে দোকানগুলো তুলে দিয়েছিল রঙ্গলাল। সেখনেই একে একে কাপড়ের দোকান হয়েছে।

ফ্রেণ্ডস্ কেবিনে তখনও গুলতান চলছিল। জোর তক্ক। এখানকার সেদ্ধ চাল যায় কোথায়? রেশানে এত খারাপ চাল আসে কোত্থেকে? পাতাল রেল কবে চালু হচ্ছে? বর্ষা কি এবারে দেরিতে আসছে—এরকম সব কথা হচ্ছিল।

কোণের দিকে বসে রঙ্গলাল এক কাপ চা চাইলো।

রেস্তোরাঁয় একখানি কাগজ। সকাল থেকে খদ্দেরদের হাতে ঘুরে কাগজখানার আর কিছু নেই। হলদে নিউজপ্রিণ্টে কালি মাখানো কাগজখানি চালানোই রঙ্গলাল সেনের কাজ। একদা ছিল সবার কাগজ। ঘরে ঘরে চলতো। এখন বছর তিনেক হলো—আরেকখানা কাগজ সে-জায়গা দখল করেছে। রঙ্গলাল যে কাগজ চালায়, তার পপুলারিটি কমতির দিকে। ফি মাসে বিক্রি কমছে।

আজ কিছুকাল হলো—সে একা একা খুঁজে বেড়াচ্ছে—কেন দৈনিক প্রভাত আগের মত চলছে না? পাবলিক কেন আর প্রভাতকে তাদের সঙ্গী মনে করছে না? কয়েক বছর ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যানের ফতুয়া গায়ে জন্মদিনের উৎসবের ছবি খুব ঘন ঘন ছাপা হয়েছে। অনশন ধর্মঘটীদের পুলিস পিকেট এসে তুলে দিলে—প্রভাত লিখেছে—সমাজবিরোধীরা উৎখাত। নতুন বাবা এবার ক্ষমতায় এল—তাদের সভা-সমিতির খবরাখবর দৈনিক প্রভাতে কোনমতে নমঃ নমঃ করে বেরিয়েছে—সাতের পাতায়—নিচের দিকে।

এখন তার দাম দিতে হচ্ছে। সে নিজে এতক্ষণ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ছিল। আকাশের অবস্থা, ভিড়ের চাপ, কলকাতার ট্রাফিকের ওপর প্রেসার, হাওড়া-শেয়ালদায় লোকাল ট্রেনের টিকিট সমস্যা—

তাছাড়া আগামীকাল সন্ধ্যার মুখে মুখে ময়দানের সভার সময় যেসব মশাল জ্বলবে—তার সিকিউরিটি প্রবলেম—সবদিক একা একা খতিয়ে দেখেছে রঙ্গলাল।

ফটোগ্রাফার সূর্য হেলে পড়লে কেমন লাইট পেলে সবচেয়ে ভালো ছবি তুলতে পারবে—সে-কথাও ভাবতে হচ্ছে রঙ্গলালকে। পার্টি লিডার চিফ মিনিস্টার, জনতার ছবি—ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের শেষে মালটিস্টোরিড অফিসবাড়িগুলো ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডে থাকা চাই। ছবিতে আর থাকা চাই মানুষের মাথা।

একটা মেইন স্টোরির সঙ্গে নীতিগত ঘোষণা, বন্দীমুক্তির প্রতি-শ্রুতি, ভিড় থেকে কোন সাধারণ শ্রোতার বিশেষ রিপোর্ট—এইসব দিয়ে গাদিয়ে কাগজ ছেড়ে দিতে হবে রাত সওয়া একটার ভেতর।

এই লাস্ট চান্স। এখন চলতি হাওয়ার সঙ্গী হতে হবে। ভাসতে ভাসতে দরকার মত তীরে উঠে পড়ে অবজারভার বনে আবার রাস্তাও খোলা রাখতে হবে। দৈনিক প্রভাতের পাঠকদের যা প্রোফাইল—তা হলো—নিম্নবিত্ত, খুদে ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার, প্রাইমারি টিচার, নাইট স্কুলের বয়স্ক পড়ুয়া। এরা না-বাম, না-দক্ষিণ। হিসেবী। সন্দেহ-প্রবণ। আবেগে ভেসে যায়। অপমানিত হলে বেঁকে দাঁড়ায়। থ্যাঙ্ক ইউ জওহরলাল। তুমি যে এ কি কল বানিয়ে রেখে গেছ—জবাব নেই। নিঃশব্দে একজন গৃহস্থ ঘরে বসে ঠিক করে দেবে পার্টির ভাগ্য। পোস্টার, জনসভা, মিছিল দিয়ে আর তার মনে দাগ কাটা যাবে না।

চায়ের দাম দিতে গিয়ে দেখলো, ঝুল-পকেটের মানিব্যাগে শুধু একশো টাকার নোট। দু-চারখানা পঞ্চাশ টাকার। মাইনে পেয়ে তক ব্যাগেই রেখেছে রঙ্গলাল। এ মাসটা সে রেখে দেখবে : তার ধারণা, খুকীদের মা অগোছালো। ঠিক ঠিক হিসেব করে চলে না বলে মাসের বিশ তারিখেই টাকা ফুরিয়ে যায়। এবার সে নিজেই সংসার চালাবে। অন্তত এ মাসটা। মাথাপিছু একশো গ্রাম মাছ, পঁচাত্তর গ্রাম চাল, সবজি একশো গ্রাম—সব মিলিয়ে ন্যাশনাল ডায়েটে যা খাবার ঠিক

করা আছে একজনের জন্যে—তার চেয়ে তো কম হবে না। এভাবে চললে টাকার টান তো পড়বেই না—চাই কি সারপ্লাস হতে পারে। একটা মাস সে এইভাবে রুবিকে দেখিয়ে দিতে চায়।

একখানা দু টাকার নোট পাওয়া গেল ব্যাগে। সেখানা দিল রঙ্গলাল। খুচরো নিয়ে দোকান থেকে রাস্তায় বেরোতেই তার কাবলি জুতো আবার চলতে লাগল—নিয়মিত তালে—আমি নিয়েচি—তুই দেকেচিস? আমি নিয়েছি—তুই দেকেছিস। সেই তালে হাঁটতে হাঁটতে রঙ্গলাল সেন দৈনিক প্রভাতের নিউজ এডিটর—বিড়বিড় করে বলতে লাগলো—আমি লোফার—আমি একজন জাত লোফার।

বৈশাখের গরমে সারা কলকাতা তেতে উঠেছে। সেই অবস্থায় রঙ্গলাল ফ্রেণ্ডস কেবিন থেকে পাওয়া কয়েকটা কিউ মনে রাখতে চাইলো। সেগুলো হলো—পাতাল রেল কবে হবে? এখানকার সেদ্ধ চাল কোথায় যায়? বর্ষা কি আসন্ন? এসব সাবজেক্টে এখুনি স্টোরি চাই। রিপোর্টার লাগাতে হবে। তাজা আনকোরা স্টোরি। কপিতে ফ্রেসনেস চাই।

এখন আর কোন রেস্তোরাঁয় যাওয়া যায়। দুপুরে বাঙালীপাড়ার রেস্তোরাঁ ফাঁকা হয়ে যায়। এসব এলাকা রঙ্গলালের যৌবনের—স্টুডেণ্ট লাইফের উপবন। খুরির চা। সত্যিকারের লবঙ্গ-বসানো লবঙ্গলতিকা। আট আনায় মাংস-ভাত, ডাল তরকারির মিল: তিরিশ টাকায় মাস-কাবারির ব্যবস্থা ছিল।

হাতঘড়ি দেখে চমকে উঠলো। দুটোর ভেতর অফিসে না পৌঁছলে তো মুশকিল। তাড়াতাড়িতে বাসে ওঠা দরকার। এত বেলাতেও বাসে ভিড়ের কোন কমতি নেই। ভ্যাপসা গরম। এখন গাড়িটা থাকলে খুব ভালো হতো। থাকলে অবিশ্যি রঙ্গলাল সেন ব্যাকসিটে বসে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের গা ধরে যেতে যেতে জনসভার বক্তৃতা মঞ্চ দেখতো। মাঠে নেমে পড়ে ডেকরেটরদের সঙ্গে কথা বলে এখন একটা উৎসবের জন্যে খরচখরচার কোন আন্দাজই সে কোন দিন পেত না। পেত না

ফ্রেণ্ডস্ কেবিনের গুলতানির স্বাদ। পাবলিকের মনের ঠিকানা। যা কিনা সর্বদাই পালটে পালটে যাচ্ছে। এই ওলোটপালটের সঙ্গে থেকে থেকে সদাসর্বদা তৈরি থাকতে হলে সবার আগে পদাতিক হওয়া দরকার। তাই হয়ে উঠছে রঙ্গলাল। তার হওয়া দরকার। বাসে উঠে মাথার ওপর রড ধরে বুঝলো, ট্রান্সপোর্টের ওপর এখুনি গরম গরম খবর দিলে পাবলিক খাবে। বাসের পাদানিতে পাবলিক ঝুলছে—এ তো ছাপা হয়ে হয়ে পচে গেছে। এবার দিতে হবে বাসের ভেতরের ছবি। প্যাকড্ লাইফ সার্ডিনস্।

কিন্তু বাসে উঠেও স্বস্তি ছিল না রঙ্গলালের। পাঞ্জাবির ঝুলপকেটের মানিব্যাগে মাসের পুরো মাইনে। এর থেকে বাড়ি ভাড়া, দুধ, ইলেকট্রিক বিল, জমাদার ইত্যাদি পরিষ্কার করে—যেসব কাজ বাকি—তা হলো—একশো হলুদ, পঞ্চাশ শুকনো লঙ্কা, চারটে রেশন, রোজকার কাঁচা-বাজার। এসব খুটিনাটির সঙ্গে মিশে আছে—জটিল এক প্যাকেট ব্লেড, তিনখানা গায়ে মাখার সাবান, রোজ একশো গ্রাম করে খুশির জন্যে কিমা, মাসে দুটো গুঁড়ো দুধ। এসব বাবদে রাখা টাকা যদি পকেটমার হয়ে যায়। রুবি বেশ গায়ে হাওয়া দিয়ে কাটাচ্ছে। আমাকে যদি একটা ক্যাশ বাক্সো দিত। তার জন্যে আলাদা তালাচাবি। তা হলে এমন পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো না।

রেখেছিল টেবিলের ড্রয়ারে। দিন চারেক পরে মনে হলো—তিনখানা দশ টাকার নোট কমে গিয়েছে। অনেক ইন্টারোগেশানের পর জানা গেল—মলি সরিয়েছে। চুরির পরেও তার বড় মেয়েটা নির্বিকার। সদলে তিনটি ম্যাটিনি শো, আইসক্রিম, ডালপুরিওয়ালার বাকি ছিল—তা ক্লিয়ার করতে হলো। যেন ন্যায্য কোন খরচের হিসেব দিয়েছিল মলি। রঙ্গলাল কিছু বলেনি। গুণে গেঁথে নিজের গায়ের পাঞ্জাবির ইনসাইড পকেটে লুকিয়ে রেখেছে। নজর রেখেছে—লুকিয়ে লুকিয়ে। এখন এই টাকাগুলোই তার এলোমেলো হেঁটে বেড়ানোর পক্ষে বাধা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে ঢুকে এয়ারকুলারের আবহাওয়ায়

রঙ্গলালের শীত করতে লাগল। দেওয়াল জুড়ে আগামী ছ'মাসের প্রোজেকশন রিপোর্ট কাটতি বাড়ার গ্রাফ পিচবোর্ডের চার্ট বেয়ে ঘরের লিনটেল অব্দি উঠে গেছে। দুটি মান্থলি, তিনখানা উইকলি, একখানা ফোর্টনাইটলি ছাড়াও এ-প্রতিষ্ঠানের তিন ভাষায় তিনখানা ডেইলি। খেলা, সিনেমা আর ছেলেমেয়েদের জন্যে তিন তিনখানা উইকলি এখন দাঁড়িয়ে গেছে। একখানা সাহিত্যের মান্থলি বাঙালিদের বাড়ি-বাড়ি ঢুকে গেছে। ডাইজেস্ট ধরনের আরেকখানা মাসিক এখনো হুইলার স্টলে পড়ে থাকে। শেয়ার মার্কেট নিয়ে ফোর্টনাইটলি ওরকমের আরও তিনখানা কাগজের সঙ্গে একাই লড়ছে। হিন্দি আর ইংরেজি ডেইলি দুটো দিল্লিতে পাত্তা পায়। অনেক সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঠেলে উঠলেও বাংলায় দৈনিক প্রভাত গত তিন বছর কাটতির দিক থেকে প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। বরং কিছুটা পড়ে মাঝে মাঝে—আবার সামলে নেয়।

নিঃসন্তান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ষোল আনা কাগজ-করা-লোক। তিনি কোনদিন নাক গলাননি বলে সবকটা কাগজই ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়েছে। তিন ভাগনেকে ম্যানেজমেণ্টে বসানোর পর তাঁরা নানা রকমের পোশাক পরে সেজেগুজে আজ তিন-তিনটে বছর শুধুই নাক গলাচ্ছেন। স্থির কোন নীতি ঠিক করা যায়নি বলে দৈনিক প্রভাত এখন কিছুটা খোঁড়া।

অথচ এই রঙ্গলাল সেন দৈনিক প্রভাতকে সর্বদাই কেমন বেড়ে উঠতে দেখেছে। সেও ভার নিল—দৈনিক প্রভাতও খোঁড়াতে শুরু করল। ভাগনেরা ঘন ঘন মিটিং করে এলোমেলো ডিসিসন চাপিয়ে দিয়ে প্রভাতকে আরও ক্লান্ত করে তুলেছে।

বড় ভাগনে রঙ্গলালকে বললেন, বীরপুরুষের ছবি ছাপুন। বিদেশী গল্প। সচিত্র। তার সঙ্গে অনীতা মার্ডার কেসের সওয়াল জবাব আবার বড় করে ছাপুন। চণ্ডীগড়ে দেখলাম—ট্রিবিউনের একটা পাতা তো—

রঙ্গলাল মাঝপথে থামালো। পাঞ্জাবে আজও মধ্যবিত্ত বলে কিছু নেই। বাঙালী মিডল ক্লাসের বয়স দেড়শো বছর। তাঁদের ওসব দিলে

তাঁরা অ্যাকসেপ্ট করবেন না। বরং প্রভাতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু কিনতে শুরু করবেন। তার চেয়ে ট্রাম-বাস, হাসপাতালের হাল, রাইটার্সে ক্ষমতার লড়াই—ইনার স্টোরি দিয়ে যেমন তুলে ধরা হচ্ছে—তাই চলুক।

ওসব তো সবাই দেয়। লাভটা কি হচ্ছে? বেড়েছে?

আমরা অনেকদিন দিইনি। এখন দিয়ে দিয়ে বিশ্বাসী করে তুলতে হবে। এজন্যে সময় চাই। বাড়ছে তো নিশ্চয়। এখানে রঙ্গলাল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকালো। চেয়ারম্যানের মত মাঝের চেয়ারটিতে তিনি বসে আছেন। তিনি রঙ্গলালকে গোডাউন ক্লার্কের সময় থেকে চেনেন। রঙ্গলাল—এই মানুষটির পেছনকার ইতিহাস জানে। পড়েছে বইতে। ব্রিটিশ আমলে ওঁর পিতৃপুরুষ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে সরকারী অত্যাচারের খবর যোগাড় করতেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহের পরেকার বাংলাদেশ। সাহেবরা বাঙালীদের লাথি মারে—সন্দেহ হলে—নির্যাতন চালায়। সেই সময় তিনি সাহস করে সে সব খবর ছেপেছেন। বাঙালীর বিশ্বাস তিনি পান।

সেই হারানো বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্যেই রঙ্গলাল সেন দৈনিক প্রভাতকে কঠিন পথ দিয়ে নিয়ে চলেছে এখন। পাবলিক যেদিন থেকে দৈনিক প্রভাতকে তাদের সঙ্গী মনে করবে—সেদিন থেকেই প্রভাত আবার এক নম্বর। এই সাধারণ জিনিসটা ভাগনেদের বোঝাতে ভীষণ বেগ পেতে হয় রঙ্গলালের।

মেজো ভাগনে বললেন, এমন স্টোরি ছাপুন—যা কিনা মেয়েরা মাথার চুল খুলে দিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়বে।

সে স্টোরি চাইলেই পাওয়া যায় না। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া যায়। তাতে সময় চাই। পাবলিক যা চায়—তা যেমন দিতে হবে—আবার পাবলিকের যা চাওয়া উচিত—তাও দিতে হবে। নইলে পরে আবার আমরা বিপদে পড়ব। অ্যাহেড্ অব টাইম না থাকতে পারলে পরে আর সামলানো যায় না।

এতক্ষণে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কথা বললেন। একদা নিজে ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন থেকে লেখা—সবই যোগাড় করেছেন তিনি। কলকাতার রাস্তা পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। মন খুশি থাকলে টপ্পা গেয়ে ওঠেন। বাই রোডে আচমকা গৌহাটি কিংবা নাগপুর চলে যাবেন। পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তিনি পাহাড় দেখে থাকেন। সূর্যাস্ত কিংবা মনোমত সরোবর। এসব শোনা যায় ওঁর খাস ড্রাইভারের কাছ থেকে। এসব এখন এ প্রতিষ্ঠানের গল্পকথা।

এম ডি বললেন, বুঝলে রঙ্গলাল—তোমার একটা কাজ আছে। প্রধান মন্ত্রীর মেয়ের বান্ধবী এখানকার আর্মির এক মেজর জেনারেলের বউ। আমি জানি। তা ওই জেনারেল সাহেবের বউয়ের কুকুর ডগ শোতে নেমেছে। তোমায় বাপু ছবি তোলাতে হবে। রিপোর্ট লিখবে তুমি নিজে। পয়লা পাতায় যাওয়া চাই খবরটা।

কিন্তু ?

জানি রঙ্গলাল। এতে আমাদের দৈনিক প্রভাতের কোন উপকার নেই। কিন্তু তবু করতে হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ইন্টারেস্টে। তুমি আজকাল পার্টিতে যাচ্ছো না কেন ?

ভাল লাগে না।

না। তা হবে না। তোমায় যেতে হবে রঙ্গলাল।

আমার শরীরটা ভালো নেই। যা খাই—তাই ফ্যাট হয়ে গিয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছি।

আমার মত সকালে বেড়াবে। গাছপালা দেখবে।

রঙ্গলাল কিছু বলল না। তখন এম ডি-র ছোট ভাগনে বলল, কাল থেকে আপনার মুখ থেকে আমি মদের গন্ধ পেতে চাই। দুপুরে অফিসের অ্যাকাউন্টে আপনি লাঞ্চ দিন দরকার মত।

রঙ্গলাল সেন বেঁকে দাঁড়ালো প্রায়। কাকে লাঞ্চ দেব ? কার সঙ্গে মদ খাবো ? দৈনিক প্রভাতের রিডারদের পাশে মদ একটা ট্যাবু। তাছাড়া—

কি ?

কাউকে ধরে এনে লাঞ্চ দিলেই কি সুবিধে হবে কোন ? ধরে ধরে খাওয়ালে লোক তো বিরক্তও হতে পারে।

এম ডি পড়েছেন মুশকিলে। একদিকে তাঁর ভাগনেরা। অন্যদিকে রঙ্গলাল। দু'দিক সামলাবার জন্যে তিনি বললেন, এটা তো পাটের ব্যবসা নয়। সব বুঝেশুনে এগোনোই ভালো।

নিউজ ডিপার্টমেণ্টে ফিরে রঙ্গলাল দেখলো ওয়াল ক্লকে প্রায় চারটে বাজে। রিপোর্টাররা সবাই এখনো ফেরেনি। ফটোগ্রাফারদের ঘরে ইণ্টারকমে ফোন করে রঙ্গলাল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলল, কিভাবে কালকের ময়দানের সভার ছবি তুলতে হবে। কার কার মুখ থাকছে ? জানা চাই ছবিতে। কোন্ ব্যাকগ্রাউণ্ডে। জনতার মাথা। কিংবা মুণ্ডু যেন ছবির একটা দিক ভরে দেয়।

রাত আটটা নাগাদ বন্দীমুক্তির ওপর নতুন সরকারের স্টেটমেণ্ট এসে গেল। খবরটা পয়লা পাতার। তার সঙ্গে দিতে হবে আগের সরকারের অপকর্মের ওপর তদন্ত কমিশন বসানোর খবর। খবরের কাগজকে টিকতে হলে ক্ষমতাসীন দলের ভেতরকার ঝগড়াঝাঁটি তুলে ধরতেই হবে। পার্টি বসের সকাল সন্ধ্যের খবর চাই। চাই দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিমাতৃসুলভ আচরণ কথা দুটো কোথাও জুড়ে দিতে হবে। আর দিতে হবে আগের সরকারের অপব্যয়—পুলিসী নির্যাতন আর চারের পাতার অনেকটা জুড়ে কলম লেখকদের সবজান্তার স্নবারি। এসব লেখা এভাবে শুরু হয়—আমি তো আগেই বলেছিলাম····

বাঙালী একটি অদ্ভুত জাতি। এক এক সময় মনে হয় রঙ্গলালের, দেশ স্বাধীন হয়েছিল যত লোক নিয়ে—এখন দেশে তার ওপর আরও কুড়ি পঁচিশ কোটি লোক জন্মেছে। যদি কিছু কাজ না করে থাকে—যদি ফসল না বেড়ে থাকে—তাহলে তো এই বিশ পঁচিশ কোটি লোক না খেয়ে মরে যেত। কিন্তু তা তো যায়নি। নিশ্চয় অনেকে আধপেটা খেয়ে আছে। কিন্তু কিছু তো থাকে। অনেক কিছু করার কথা।

অনেক কিছু হয়নি। কিন্তু অনেক কিছু তো হয়েছে। এ কথা কাগজে লিখলে কাগজ চলে না।

বেশি রাতে বাড়ি ফিরে রঙ্গলাল দেখলো, রুবি ঘুমোচ্ছে। ফাঁকা লাল বারান্দায় মলি আর ললি জেগে বসে আছে। সঙ্গে খুশি। রবারের বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুশিকে দৌড় করাচ্ছে মলি।

বারান্দায় পা দিতেই খুশি এসে রঙ্গলালের পা বেয়ে উঠলো। তোরা ঘুমোসনি ?

খুশিকে ব্যায়াম করাচ্ছিলাম। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, বসে থাকলে খুশি মোটা হয়ে যাবে।

তোরা খেয়েছিস ?

কখোন।

তোদের মাকে ডাক। খিদে পেয়েছে।

আমি ভাত দিচ্ছি—বলে মলি উঠে দাঁড়ালো।

খুশি ডাকে না কেন ? অ্যালসেসিয়ান কুকুর—

ও কুকুর নয় বাবা। ললি খুশিকে কোলে তুলে বলল, ডাক্তারবাবু বলেন—অ্যানিমাল—

৩

এবার গুঁড়ো সাবানের সঙ্গে একটা করে বয়ম দিচ্ছে। কালো রঙের প্লাস্টিকের। দু কেজি একসঙ্গে কিনলে পাওয়া যায়। মাসকাবারি মনোহারী দোকান থেকে তাই একটা কিনে রুবি বাড়ি ফিরে এল। মলি আর ললি স্কুলে। খুশিকে দুপুরের খাবার দিতে হবে। অনেকগুলো কাপড় কাচাকাচি আছে।

রুবি ঘরে ঢুকে দেখলো, রঙ্গলাল খাবার টেবিলে বসে সকালের সব কটা কাগজ নিয়ে বসেছে। এই সময়টা রঙ্গলাল প্রভাতের পাশাপাশি সব কাগজ রেখে পড়ে দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কোনটা স্কোর করলো প্রভাত। কোনটা পারেনি। সব টুকে টুকে নেয় প্যাডের কাগজে। গেইন পয়েন্টস। লস পয়েন্টস।

রুবি জানে, এটা হলো তার স্বামীর হোমওয়ার্ক। বছরের পর বছর নিত্যদিন এ কাজ করে আসছে রঙ্গলাল সেন।

হঠাৎ কি খেয়াল হলো রুবির—ঝুঁকে দেখলো, খুকিদের বাবা মন দিয়ে পার্সোনাল কলম দেখছে। খুদি-খুদি টাইপ।

রুবির খোঁপাটা ভেঙে দিয়ে, গন্ধতেলের বাস রঙ্গলালের নাকে লাগলো। ফ্ল্যাট কিনবে ?

একথায় রুবি আরও ঝুঁকে পড়ে কাগজের বিজ্ঞাপনটা পড়তে গেল।

রঙ্গলাল বলছিল, তিনটে বেডরুম—একটা বড় লিভিং রুম। দুটো বাথ। কিচেন। দুটো ব্যালকনি। তাছাড়া কাজের লোকের থাকবার আলাদা একটা ঘর—তার সঙ্গে বাথরুম! মোটমাট এক লাখ আঠাশ।

অত টাকা কোথায় পাবে ?

অনেকদিন পরে একদম নতুন বিয়ের পরেকার ঢঙে রুবি তার চিবুক রঙ্গলালের কাঁধে ঠেসে ধরে কাগজ দেখছিল—আর কথা বলছিল।

রঙ্গলাল বলল, আমরা যা মাসে মাসে ভাড়া দিয়ে থাকি—সেটাই তো ইনস্টলমেণ্ট হতে পারে। গোড়ায় কিছু বেশি দিয়ে ফ্ল্যাটের অকুপেশন নিতে হয়। তারপর মাসে মাসে শোধ করলেই চলবে।

রুবির কাছে ব্যাপারটা যেন হরলিকসের শিশির ভেতরকার কুপন মেলানো। কিংবা জেম বোনাস স্ট্যাম্প দিয়ে চায়ের কাপ সাজিয়ে দেবার ট্রে কেনা। রঙ্গলালের কথায় লাফিয়ে উঠলো, তাহলে তো আমরা ফ্ল্যাট কিনতে পারি। আমি তোমায় ব্যাঙ্কের রেকারিং থেকে হাজার বারো দিতে পারি। তুমি আর কিছু পারবে না ?

অফিস কোঅপারেটিভ থেকে বোধহয় কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার আটেক পেতে পারি। আর পাবো থ্রিফট ফাণ্ড থেকে। সেখানেও কিছু আছে আমার।

দু হাত দিয়ে প্রায় তালি বাজিয়ে বসলো রুবি। তাহলে তো আমাদের ফ্ল্যাট হয়ে যায়। আমি পুব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট চাই। দশতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ার মাথা হাওড়া ব্রিজের শিরদাঁড়া—সব দেখতে চাই আমি।

চশমাটা দেবে একটু।

রঙ্গলালের বাইফোকাল।

চশমা নিয়ে বসোনি কেন ? চোখের বারোটা বাজাবে। বলে বুক-সেলফের ড্রয়ার থেকে চশমাটা বের করে আনলো রুবি।

রঙ্গলাল অনেকদিন পরে তার নিজের স্ত্রীকে দেখছিল। দেখতে ভালোই লাগছিল। রুবি এগিয়ে আসতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরলো। যত বয়স বাড়ছে—তত খুকী হয়ে যাচ্ছো।

কোথায়।

রঙ্গলাল প্রায় বারো বছর পরে দিনের বেলায় বউকে চুমু খেতে যাচ্ছিল।

রুবি পিছিয়ে গেল। ফ্ল্যাট দেখলে হয়। কেমন যে বাড়িগুলো ? ঘুঁটেকয়লা রাখার জায়গা কি থাকে ?

চল না দেখে আসি। বলে দৈনিক প্রভাতের নিউজ এডিটর রঙ্গলাল মনে মনে একটা ইকোয়েশন কষে নিল। প্রভাতে হাউসিং নিয়ে চার কিস্তিতে রিপোর্ট বেরোবে। তার পাশাপাশি কোঅপারেটিভে ফ্ল্যাট বাড়ির রিপোর্টও থাকবে। সে কাজও এগোবে—আবার রুবিকে নিয়ে ফ্ল্যাট দেখাও হয়ে যাবে। দু কাজ একসঙ্গে। বউকে নিয়ে অনেক-দিন বেরোয়নি রঙ্গলাল।

খুশির গলা পাওয়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ। কুকুরের বাচ্চাটাও বলিহারি। দিব্যি পড়ে পড়ে তুই দিদির আদর খাবে। গলায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে। পা টিপে দিলে চোখ বুজে পড়ে থাকবে। রঙ্গলালের চিন্তাও হচ্ছিল। মলি প্রায় ছ'টা স্কুল, বারোজন প্রাইভেট টিচার হজম করে এখন ক্লাস টেনে আছে। এর আগে এইটে দু বছর থেকে পাকা হয়ে উঠেছে। ভোর থেকে রাত অব্দি খুশি ওর সঙ্গী। সেই সঙ্গে আছে ললি। ছোটোটা ক'বছর আগেও ভালো রেজাল্ট করতো। এখন পড়া-শুনোয় খারাপ হয়ে গেছে। এবার ললি পরীক্ষায় থার্ড হলেও ফার্স্ট গার্লের চেয়ে দুশো ষাট নম্বর কম পেয়েছে। রঙ্গলাল জানতে চেয়েছিল, এমন হলো কেন ললি ?

বাঃ ! তুমি জানো না বাবা ? ফার্স্ট গার্লের বাবা স্কুল কমিটির প্রেসি-ডেন্ট। আগে থেকেই কোশ্চেন জানতো।

তুই এসব জানলি কি করে ?

ক্লাসসুদ্ধ সবাই জানে। হেড দরোয়ান বলেছে—

পাশেই মেয়েদের ঘর। জানলা দিয়ে উঁকি দিল রঙ্গলাল। ওয়ারড্রোবের আয়নায় মলির ছবি। তার কাঁধে বাচ্চা মেয়ের মত খুশি। দুখানা পা মলির কাঁধের উপর দিয়ে বের করে দিব্যি খুকিটি সেজে আদর খাচ্ছে। তাহলে ওরা স্কুলে যায়নি ? ললি সেই অবস্থায় খুশির কপালে একটা সিঁদুরের টিপ দিল। রঙ্গলাল জানলা থেকে সরে এল। ললি, মলি, খুশি—কেউ জানতে পারলো না।

রুবিকে নিয়ে বেরোবার মুখে রঙ্গলাল দেখলো, মণি এসে গেছে।

ওদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল। দাদাবাবু দাঁড়ান। গাড়িটা বের করি।

না রে। গাড়ি দরকার নেই। ট্রামে বাসে যাবো।

রুবি বেঁকে দাঁড়োলো। এখন ট্রামে বাসে উঠতে পারবে না। অফিস টাইমের ভিড় এখনো শেষ হয়নি।

খুব পারবো।

রুবি বলল, আমার তো ফিরে এসে কাচাকাচি আছে। তাছাড়া মেয়ে দুটো স্কুলে যায়নি দেখছি—চান করেনি। খুশির কিমা রান্না চাপাতে হবে।

রঙ্গলাল চুপ করে গেল। সে জানে, কাপড় কাচা রুবির কাছে একটা শিল্প। গুঁড়ো সাবান ঝাঁকিয়ে, রোদে জামা-কাপড়ের রং না জ্বলে যায় —সবদিক দেখে ভিজে কাপড়ে গুনগুন করে গাইতে গাইতে রুবি অনেক বেলা অব্দি এসব করবে।

কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ওরা দুজন ক্যামাক স্ট্রীটে চলে এল। মণি পার্কিং লটে জায়গা না পেয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

কৈলাশ নামে বিরাট এক ডিপার্টমেন্ট স্টোর। দর্জি থেকে ফটো-গ্রাফার—সবই এক ছাদের নিচে। এমনকি একজন গণৎকারও বসেছেন। পর্দা ঢাকা অ্যালকোভে। বাইরে একখানা কাঠের হাত ঝোলানো। তাতে লেখা—রুপিস টোয়েন্টি ফাইভ।

রঙ্গলাল কাগজের বিজ্ঞাপন মত খোঁজ নিয়ে জানলো, হ্যাঁ, এখানেই ফ্ল্যাটের খোঁজ পাওয়া যাবে। তবে যিনি দেখাবেন—তিনি এখনো আসেননি। একটু বসতে হবে।

রুবি দেখলো, চারদিকেই ফ্ল্যাট উঠছে। বালি, স্টোনচিপের ছড়াছড়ি। আরেকটু এগিয়ে গণৎকারের ঘরে উঁকি দিয়ে চমকে উঠলো রুবি। দেখবে এসো।

কি ?

এসো না। দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা? ভদ্রালোক তোমার কাছে আসতেন না ?

রঙ্গলাল দেখেই চিনলো। বছর পাঁচেক আগে দৈনিক প্রভাতে 'দিনটা কেমন যাবে'—যিনি লিখতেন—সেই অনাথবাবু বসে আছেন।

রঙ্গলালের চেয়ে ছোটই হবে অনাথ। সে রঙ্গলালদা বলে ডাকতো। রঙ্গলাল ডাকতো অনাথবাবু বলে।

ওদের দেখে অনাথ উঠে এল। আরে! আপনারা? আসুন! আসুন! কি মনে করে?

ফ্ল্যাট দেখবো বলে এসেছিলাম।

তা এখন তো মেহতাজী আসেননি। আমার এখানে বসুন ততক্ষণ।

ওরা বসলো। রঙ্গলাল বলল, আপনি এখানে?

বসে গেলাম। চোখানিয়াজী বসিয়ে দিলেন।

চোখানিয়া?

এ-বাড়ি, ওই ফ্ল্যাটবাড়ি দুটো, পার্ক স্ট্রীট আর লর্ড সিন্‌হা রোডেও বাড়ি তৈরি হচ্ছে চোখনিয়ার।

কিসের ব্যবসা অনাথবাবু?

পাটের ফরোয়ার্ড ট্রেডিং। কতর ভেতর ফ্ল্যাট নেবেন?

পেলে তো!

এ-বাড়িতে সব দু লাখ তিরিশের ওপর। আমি বললে অবশ্য স্কোয়ার ফুট কিছুটা কমতে পারে।

কিরকম! অবাক হয়ে তাকালো রঙ্গলাল। এই অনাথবাবু, তার ওখানে কয়েক কলম লিখে সংসার চালাতো। গ্রহনক্ষত্রের কথা লিখে। এখন এমন কি হয়েছে যে—এত বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গণৎকারীর চেম্বার?

চোখানিয়া আমার শিষ্য।

বেশ গর্বের ভাব নিয়েই বলল অনাথ। আরও বলল, দরকারে কিস্তির ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। আমার কথা ফেলবে না চোখানিয়া। আমি কেতুর অবস্থান বলে দিলে তবে পাট কেনে। পাট ছেড়ে দেয়।

রাহু কেতু আপনার কথা শুনে চলে !

তা বলতে পারেন। আমার কথায় স্টোন ধারণ করে চোখানিয়ার এক জাহাজ গানি বেঁচে গেল। নয়তো জলের দরে আমেরিকার বাজারে ছেড়ে দিয়ে কোনক্রমে বাঁচতে হতো।

আমার হাতটা একটু দেখবেন ?

দেখবোখন। এসেছেন তো ফ্ল্যাট দেখতে। আগে বৌদিকে দেখান।

রুবি এবার প্রথম কথা বলল, এ-বাড়িতে ফ্ল্যাট খালি আছে ?

আশিটার মত ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে। বিক্রি হয়ে যাবে অবশ্য। আপনার কেমন চাই বৌদি ?

এই বেশ খোলামেলা—

এ-বাড়িতে পাবেন। বারো তলায় খালি আছে তিনটে। কিন্তু দাম পড়বে দু'লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা করে।

ওরে বাবা ! ও আমরা কিনতে পারবো না।

ইনস্টলমেণ্ট করে দেব আপনার জন্যে।

না। তা হবে না। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না ?

অবশ্য এ ফ্ল্যাটে আপনাদের অসুবিধে হবে। এখানে যারা থাকবে—

কারা থাকবে বলুন তো ?

যাদের মাস গেলে অন্তত দশ হাজার টাকা আয়। মেইনটেনান্স আছে। আছে ট্যাক্স। গারেজের জন্যেই আলাদা পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে।

গ্যারেজ কোথায় ?

আণ্ডার গ্রাউণ্ড। আমি বললে, চোখানিয়া আপনাদের নব্বই টাকা স্কোয়ার ফুট দিয়ে দেবে—

না ভাই। এ ফ্ল্যাট আমাদের চলবে না।

তাহলে লর্ড সিন্‌হা রোডে দেখুন। আমি লোক দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে।

রঙ্গলাল বলল, এসেছি যখন—এখানকার ফ্ল্যাটও দেখে যাই।

বেশ তো।

অনাথবাবু লোক দিল সঙ্গে। রঙ্গলাল লক্ষ্য করলো এখানে অনাথের দারুণ পসার। বলতেই লোক চলে আসে। কর্মচারীরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। গ্রহনক্ষত্রের ফরোয়ার্ড বাণিজ্য করে বেশ শিষ্য সেবাইত যোগাড় করেছে। এ না হলে বাঙালী!

লিফ্‌টে বারো তালায় উঠে রুবির মন দুলে উঠলো। ফ্ল্যাট না নন্দনকানন। টেনিস কোর্টের মত লম্বা চওড়া লিভিং রুম। দক্ষিণ খোলা। দাঁড়ালে সত্যি সত্যি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখা যায় ময়দানের আদ্যোপান্ত, সারা গঙ্গা—আর হাওড়ার খানিকটাও।

নেমে আসতে ইচ্ছে করছিল না। তবু আসতে হলো।

এবারে লর্ড সিনহা রোড।

মণি গাড়ি রাখলো—এয়ার কণ্ডিসানড্‌ মার্কেটের উঠোনে।

আগেকার সাহেব বাড়ি ভেঙে একালের ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। তিন-চারখানা। গেটে একটা সুন্দর নামের প্লেট। মধুবন। ভেতরে গাড়ি পার্কিংয়ের অনেকটা জায়গা। বাড়ি তৈরির কাজ এখনো শেষ হয়নি। নিচে কালো চাপ-দাড়ির একজন বেশ স্মার্ট লোক এগিয়ে এল। ফ্লানেলের শার্ট আর ট্রাউজার। কবজিতে বড় ডায়ালের বিদেশী ঘড়ি। মিস্ত্রি খাটাতে খাটাতেই কথা বললেন, ফোন পেয়েছি। গুরুজী পাঠিয়েছেন।

রঙ্গলাল বুঝলো, গুরুজী মানে অনাথবাবু। এখানে তাহলে আনাথ একজন কেউকেটা। ফেরার পথে নিজের হাতখানা একবার দেখিয়ে যাবেন নাকি? দৈনিক প্রভাতের সার্কুলেশনে কবে থেকে আপওয়ার্ড ট্রেণ্ড দেখা যাবে?

আমি সুব্রত বিশ্বাস। চলুন ফ্ল্যাট দেখবেন। সিক্সথ্‌ ফ্লোরে পাশাপাশি টু-রুম ফ্ল্যাট খালি আছে।

দোতলা-তেতলায় নেই ?

বুক হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক নিয়েছে। অফিস করবে।

ওপরে উঠে রঙ্গলাল বুঝলো, মধুবনই বটে। খুপরি খুপরি ঘর। তাই ভাগঝোক করে সব ফ্ল্যাট। কোনটার দাম লাখ টাকার নিচে নয়। তাও কোন কিস্তি নেই। তবে ব্যবস্থা খারাপ নয়। ওরই ভেতর ড্রেসিং-রুম অব্দি আছে।

রুবি বলল, একদম হার্ট অব্ দি সিটি। এই একটা বড় সুবিধে। কিন্তু দাম যে প্রচণ্ড। আর অত টাকাই বা পাবো কোত্থেকে ?

গুরুজীকে সব খুলে বলুন না বৌদি।

চমকে তাকালো রঙ্গলাল। সে চোখ দেখে সুব্রত বিশ্বাস বলল, আপনি তো মলি ললির বাবা !

হ্যাঁ। আপনি ?

আমি তো ও বাড়িতে যাই। মলি আমায় চেনে।

রুবি এবার চিনতে পেরেছে। আপনি চারতলায় সুদক্ষিণাদের ওখানে যান তো। এবার চিনতে পেরিছি। ঠিক আছে। আপনি আছেন যখন ভালো ফ্ল্যাটই পাওয়া যাবে এখানে।

আসুন না সময় নিয়ে একদিন। এদের আরও বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আমি এদের সিভিলের কাজ দেখি।

রঙ্গলাল ফস করে বলে ফেললো, কোত্থেকে পাস করেছেন ?

এল. সি. ই. জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিক থেকে—

মনে মনে অঙ্ক কষছিল রঙ্গলাল। এসব ফ্ল্যাট তাহলে কারা কিনবে ? চাকরি করে তো এ ফ্ল্যাট কেনা যায় না। বিশেষ করে এই বাজার দরে সংসার চালাবার পর। তাহলে ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি হচ্ছে কি করে ? কারা কিনছে ? একটা সুন্দর সারভে রিপোর্ট যদি তিন-চারজন রিপোর্টার দিয়ে করানো যায়—তাহলে চমৎকার হয়। তিন কিস্তিতে বের করতে হবে। সঙ্গে চাই ছবি। টেন্থ ফ্লোরের লিভিংরুম থেকে ভিক্টোরিয়ার মুণ্ডটা ধরতে হবে লেনসে।

গাড়িতে উঠে রুবি বলল, মধুকে চিনতে পারনি।

মধু ?

ওই তোমার কি বিশ্বাস—

সুব্রত বিশ্বাস।

ওরই তো ডাকনাম মধু। চারতলায় সুদক্ষিণার ওখানে যায়। ওই আমাদের বেবির ওখানে—

তাই বল। সুদক্ষিণা বললে চিনবো কি করে ?

তাই বলে বেবি বলবো ? বি. এ. বি. টি. পাস। গার্লস স্কুলে পড়ায়। সন্ধ্যে হলে মধুর সঙ্গে বসে গল্প করে। এক একদিন সিনেমায় যায়। থিয়েটার দেখে দুজনে। একদিন তো মলি ললিকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল।

এটা কি ভালো হচ্ছে রুবি ? আমাদের মেয়ে দুটো পেকে যাচ্ছে না ?

পাকলে খুশি হতাম আমি। সারাদিন খুশিকে নিয়ে ধিঙ্গিপনা। তার চেয়ে একটু-আধটু প্রেমট্রেম শিখুক। ম্যাচিওরড্ হবে।

মধু আর বেবির মত তো বয়স হয়নি মলিদের—

হলে কি করবে জানি না। বলে রুবি ভাঙা খোঁপাটা বেণী করে নিতে লাগলো। এই যে মধু রোজ সন্ধ্যেবেলা আসে, গল্প করে—তার চেয়ে বিয়েটা করে ফেলা উচিত ছিল না ? সময় তো বসে নেই।

ওরা হয়তো ওইভাবেই বাঁচতে চায় রুবি।

আমি বলবো সেলফিস। মধুদের বড় ফ্যামিলি। সে ফ্যামিলিতে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলার ভয়ে বেবি এখানে পড়ে আছে। ওর বাবার কাছে থাকে সারাদিন। রাতে এখানে এসে বড় মামির কাছে শোবে। আলাদা চাকর, আলাদা স্টোভ, আলাদা টিফিন খেয়ে বিবিটি সেজে মর্নিং স্কুলে পড়াতে যাবে। এসব মেয়ের কেন যে প্রেম করা—বুঝে উঠতে পারিনি। ভালো ছেলে মধু—এখন শুধু ঘুরে ঘুরে মরছে।

তুমি রুবির এত খবর পাও কোত্থেকে ?

কেন! তেমার দুই মেয়ে আছে না? তারা তো বেবিদির বশ। উঠতে বসতে বেবিদি।

ঠিক এই সময় ডাক্তার জগৎ বসু দেখলেন তাঁর 'রনি নার্সিং হোমে' একজনও ওষুধ নিতে বা 'অ্যানিম্যাল' দেখতে আসেনি। হস্টেলের বাসিন্দারা ব্রেকফাস্টের পর খেলছে। ও. টি. নিঃঝুম। একটা টিউমার কেস আছে বটে। তবে তার পেট ওপেন করতে এখনো সাতদিন বাকি।

রং কারখানার দিককার জানলাটা বন্ধ। বাতাস উঠলে হলো। অমনি হস্টেলসুদ্ধ সবাই কাশতে শুরু করবে।

জগৎ বসুর সন্দেহ, ওই কারখানায় বোধহয় কিছুদিন ধরে ঢালাওভাবে ইলেকট্রিক পাখার ব্লেড রং করা হচ্ছে। বাতাসে সেইরকম একটা গন্ধ তিনি পাচ্ছেন ক'দিন ধরে। অনেককে তিনি বলেছেন। কেউ কিছু করে না। কুকুর! তার জন্যে আবার কমপ্লেন! বেশির ভাগ লোকই তাঁর কথা শুনে হাসে।

তাই এখন তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন।

প্যাডের মাথায় হেডিং লিখলেন—প্রতিবিধান চাই।

তারপর ডাক্তার বোস শুরু করলেন—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
দৈনিক প্রভাত
কলকাতা—৭০০০০৯।

প্রিয় মহাশয়,

বিশেষ বিপদে পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। রডন স্ট্রীট মূলতঃ এতদিন গৃহস্থদের এলাকা ছিল। কয়েক বছর হলো ১০।১২ তলা বাড়ি উঠে উঠে জায়গাটা দোআঁসলা হয়ে গিয়েছে। পুরনো বড় বাড়ির কম্পাউণ্ড ভেঙে ফেলে পাতাল খুঁড়ে এক একটা দৈত্যের ভিত উঠছে। তারই আশেপাশে এই রেসিডেনসিয়াল এলাকায় নানারকমের

কারখানা বসেছে—বসছে। যেমন গ্রিল, লোহার গেট—রঙের কারখানা।

সারাদিন খটাখট আওয়াজ লেগেই আছে। তার ওপর রঙের গন্ধ।

আমি কয়েকটি কুকুর নিয়ে বাস করি। তাদের চিকিৎসা—অপারেশন—সবই আমাকে দেখতে হয়। তাছাড়া বাইরে থেকেও আমার নার্সিং হোমে কুকুর আসে। অনবরত এরকম আওয়াজে আমার এখানকার হস্টেলের কুকুরগুলো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। তার ওপর আছে রঙের গন্ধ। এসব রঙে নিশ্চয় বিষাক্ত গ্যাস আছে। নয়তো বাতাসে ভেসে আসা রঙের গন্ধ নাকে যেতেই আমার নার্সিং হোমসুদ্ধ সব 'অ্যানিমাল' কেন প্রাণান্ত কাশি কাশতে শুরু করবে?

বহু জায়গায় এ অবস্থার প্রতিবিধানের জন্যে আমি আবেদন নিবেদন করেছি। লোকাল থানায় কমপ্লেন করেও কোন ফল পাইনি। ইন্সপেক্টর দাশগুপ্ত হন্তদন্ত হয়ে তদন্ত করতে গেছেন। টাকা খেয়ে হাসিমুখে ফিরে এসেছেন। আর আমার ওপর হম্বিতম্বি করেছেন।

হম্বিতম্বি করেও ক্ষান্ত হননি। রং কারখানার টাকা খেয়ে তিনি রেসিডেনসিয়াল এলাকায় এতগুলো 'অ্যানিমাল' রাখার জন্যে আমার বিরুদ্ধে সাজানো ডাইরি করিয়েছেন।

আপনি বিচক্ষণ। আপনার সুবিচারের জন্যে আপনি আজ বিখ্যাত। সমগ্র অবস্থা খতিয়ে দেখে আপনি নিশ্চয় বুঝবেন—আমি কতটা সঠিক বা বেঠিক।

অ্যানিমাল হাজব্যাণ্ড্রিতে আমি বিদেশী ডিপ্লোমার অধিকারী। রয়েল সোসাইটি ফর দি অ্যামিলিওয়েশন অফ দি ডোমেস্টিক অ্যানিমালস-এর আমিই প্রথম ভারতীয় ফেলো। সেখান থেকেই সারজারিতে আমার সার্টিফিকেট। উপরন্তু ওদের প্যাথোলজিতে আমিই ফার্স্ট হয়েছিলাম—সারা কমনওয়েলথের ছশো স্টুডেন্টের ভেতর। এসব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। আপনি সুশিক্ষিত—আপনি সবই বুঝবেন।

আপনি নিশ্চয় জানেন—আমাদের এই কলকাতা শহর গৃহপালিত জীবজন্তু সম্পর্কে আদৌ সুশিক্ষিত নয়। বিশেষত কুকুর বলতে এই শহরের মানুষ একটি অবহেলার জীবকেই বোঝে। অথচ আমরাই তো এই কলকাতাকে সুসভ্য করে তুলতে পারি। বাতাসের সঙ্গে রক্তের বিষাক্ত গ্যাস মিশে গিয়ে আমার হস্টেলের বাসিন্দাদের নাকে ঢুকে যাচ্ছে। আপনি নিশ্চয় জানেন—ওদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। ওরা বাতাস উঠলেই কারখানার দিক নির্ণয় করে সেদিকে তাকিয়েই অনবরত ঘেউ ঘেউ করে—আর কাশতে থাকে। এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। যে-কোন জীবপ্রেমী মানুষই এ-দৃশ্য দেখলে কষ্ট পাবেন।

অথচ আমি এই অবস্থার কোন প্রতিকারই করতে পারছি না। সারাদিন আমার মন ভারি হয়ে থাকে ওদের জন্যে। এক বুধবার সকালে ওদের ক'জনকে নিয়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওরা নিষ্পাপ। রাস্তা, ঘাস আর ট্রাম লাইনের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ওদের জনা পনেরো আমার পেছন পেছন ময়দানে যাচ্ছিল।

খানিক বাদে দেখলাম—রাস্তায় ছাড়া গরুর উৎপাতে ওরা ভীষণ বিপন্ন। খালি ঢুঁসোতে আসছে। শেষে কোনক্রমে ওদের নিয়ে আমি যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছেছি—ঘড়িতে প্রায় সাড়ে ন'টা।

তখন অফিস টাইমের ভিড়। আমার ওরা খুবই সুশিক্ষিত, সভ্য, বিনয়ী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। ওদের গরিমাময় চলনভঙ্গী আশপাশের পথচারী, বাসযাত্রী, মোটরচারীদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ট্রাফিক পুলিস আমাদের রাস্তা ক্রশ করার অনুমতি দিতে চায় না। হাতের ইশারায় জানায়—আমরা যেন সারাটা ময়দান ভেঙে ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে প্ল্যানেটোরিয়ামের গায়ে ট্রাম লাইন পার হই।

বুঝুন—হাঁটাপথে তিন-চার মাইল রাস্তা। রোদ্দুরের ভেতর এই দীর্ঘ পথ পার হয়ে যখন আমার নার্সিং হোমে ফিরলাম—তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে দশ। আমরা তখন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। আপনিই বলুন—আমরা সবাই একই প্রাণীজগতের। এই পৃথিবীর জলহাওয়া, রাস্তাঘাট,

বায়ু, গাছপালায় সবারই সমান অধিকার থাকার কথা। ওরা নিশ্চয় ম্যান-ইটার কিংবা টাসকার নয়। ওরা আইনানুগ, শান্তিপ্রিয় এবং সৎ। ওদের কেন এতটা পথ হাঁটতে বাধ্য করা হলো? ওরা কি ঠেলাগাড়ি না হাতরিক্সা?—যে চৌরঙ্গী দিয়ে ওরা রাস্তা ক্রশ করতে পারবে না?

আপনার কাছে আমার প্রার্থনা—আপনি জীবপ্রেমীদের মনোকষ্ট অনুধাবন করে শক্তিশালী জনমত গঠনের জন্য আপনার লেখনী চালনা করবেন। দৈনিক প্রভাত সর্ববিষয়ে সমদর্শী। আশা রাখি ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে যদি কোনদিন আমাদের বিধান সভায় কল-অ্যাটেনশন নোটিশ তোলাতে পারি—তাহলে ক্রমে ক্রমে এ-বিষয়ে আইন প্রণয়নে মন্ত্রি-সভাকে উদ্যোগী করে তুলতে দৈনিক প্রভাতকে সহযোদ্ধা হিসেবে আমাদের পাশে পাবো।

বিনীত

রনি নার্সিং হোম জগৎ বসু

রডন স্ট্রীট

চিঠিখানা খামবন্দী করে টেবিলে রাখলেন। তারপর জগৎ বসু রেজিস্ট্রি খাতা খুলে বসলেন। একটি অ্যালসেসিয়ান শিশু তার মন উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তার নাম খুশি সেন। রেজিস্ট্রি খাতার পাতার নম্বর ১১৫৭। দুটি বালিকা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। ওরা দুজন খুশিকে যে খুবই ভালবাসে তা জগৎ বসু বুঝতে পেরেছেন। মলি আর ললি।

কিন্তু ওরা খুশিকে ঠিক তৈরি করে তুলতে পারছে না। খুশির ব্যায়াম দরকার। হাড় মোটা করতে অস্টোক্যালসিয়াম দেওয়া হয়েছে। হজমের জন্যে বলিসন। স্টুলের চেহারা হলদি। তবে এখনো টেপ ক্রিমি আছে। আর নিজের স্টুল নিজেই খেয়ে ফেলছে মাঝে মাঝে। খুশির ওই স্বভাবটা দুবোন মিলে কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। খুশিকে ওরা বেঁধে রেখে দেখেছে। ছাড়া পেলেই আবার সেই মহার্ঘ জিনিসটুকু খেয়ে বসে থাকবে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে খুশি সেনকে তার নিজের ক্রিমির হাত থেকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। জগৎ ডাক্তার স্টুলের গন্ধ বিটকেল করে দিতে খুশির জন্যে খাওয়ার ওষুধ দিয়েছেন। তাহলে যদি ও-জিনিসে খুশির অরুচি হয়। দেখা যাক কি হয়।

এ সব নিয়ে মলি আর ললি খুবই চিন্তিত। এখনো ওরা দুবোন স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। এখন থেকেই ওরা একটি অ্যালসেসিয়ানের জন্যে যতটা চিন্তা করে—তাতে ভবিষ্যতে ওরা অবশ্যই ভালো নাগরিক হবে। গৃহপালিত জীবজন্তুর জন্যে ওদের মনে মায়া মমতা রয়েছে। এটা একটা গুড সাইন।

একদিন পৃথিবী পাল্টাবেই। মানুষ তার সমসাময়িক সব প্রাণী আর প্রকৃতিজগতের সব গাছপালা, লতাগুল্মকে সমানাধিকার দিতে বাধ্য হবে। সমদর্শী হতে শিখবে। অযথা উচ্ছেদ, নিকাশ, দমনের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে মানুষ সবার সঙ্গে একত্রে এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, জল, জায়গা সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করতে বাধ্য হবে। নয়তো আমাদের ঘিরে যে বায়ুর মণ্ডল—তার বিনাশ কেউ আটকাতে পারবে না।

আমরা কি স্বল্পে খুশি হতে পারি না? কোন মাছ কিংবা গাছ প্রতিবাদ করতে জানে না বলেই আমরা কি ওদের শেষ করে ফেলবো? ওরা ফুরিয়ে গেলে তো মানুষ একদিন পাশের মানুষকে খাবার বানিয়ে খেয়ে ফেলবে। সেই মত যুক্তিও তৈরি হয়ে যাবে সেদিন। আজ সারা দেশে কত বিড়ালের গ্যাসট্রিক পেন।

খুশি সেনকে এখন ডিসটেম্পারের ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার। এই বয়সেই দেবার নিয়ম। কিন্তু বেচারির গায়ে আর ইঞ্জেকশন দেবার জায়গা নেই। ইঞ্জেকশন নিয়ে নিয়ে ওর দুটো দাবনাই ব্যথা। মলি ললিকে জগৎ ডাক্তার খুশিদের মুখের একদিককার পকেট কোথায় থাকে—তা চিনিয়ে দিয়েছে। খাবার ওষুধ সরাসরি হাঁ করিয়ে মুখে দিলে অনেক সময় শ্বাসনালীতে আটকে গিয়ে অপঘাত ঘটাতে পারে।

তাই মুখের ঠোঁট ফাঁক করে ডক্টর বোস ওদের গালের একদিককার পকেট চিনিয়ে দিয়েছে ছবোনকে। খাবার ওষুধ—ট্যাবলেট কিংবা লিকুইড এখন মলি ললিকে দিয়ে দিলে ওরা ঠিক খুশি সেনকে খাইয়ে দিতে পারবে।

খুশিদের বাড়ির নম্বরটা দেখে ডক্টর জগৎ বসু ফোনে ডায়াল করতে শুরু করলেন।

৪

সি বিচে কেউ উঠে এসে ফেরার সময় ফেনার দাগ ফেলে যায়। কিছু গেঁড়িগুগলি, ঝিনুক, শঙ্খ তীরে রেখে যায় সমুদ্র। রঙ্গলাল লক্ষ্য করেছে—মনের ভয়-ভাবনা শরীরে এমন কিছু কিছু জিনিস ফেলে রেখে যায়। বহুকাল আগে—কলেজ-জীবনের শেষ দিকটায় রঙ্গলাল একটানা —কয়েক বছর অনিশ্চয়তায় ভুগেছিল। সেবারে সে আস্তে আস্তে রোগা হতে থাকে। এক সময় তার ওজন হয়েছিল মাত্র একশো কুড়ি পাউণ্ড।

সে অবস্থা থেকে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠতে তার সময় লেগেছিল আরও কয়েক বছর। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য তার চিরকালই। কোনদিনই মাথা ধরেনি। সাউণ্ড স্লিপ। রোটারি থেকে বেরিয়ে আসা ভোর রাতের প্রথম কাগজখানায় নিজের মুখে চেপে ধরে রঙ্গলাল সেন ডিসেম্বরের রাতজাগা চোখে সেঁক দিয়েছে। নিউজপ্রিণ্টের গন্ধ তার ভাল লাগে। কতকাল ধরে সে এ সবের ভেতর আছে। এখনো বেশি রাতে বাড়ি ফিরে কড়কড়ে ভাতের থালা সামনে নিয়ে দৈনিক প্রভাতের নিউজ এডিটর যখন খেতে বসে—তখন আধোঘুমের রুবি কিংবা মাঝরাতে জেগে ওঠা খুশির আদর প্রার্থনার চেয়ে নিউজ রুমে ফেলে আসা খবরগুলো তাকে বেশি করে টানে।

একবার এক সাবান কোম্পানির সারভে করতে এসে এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির একজন সুসজ্জিতা গ্রুপ লিডার তাকে প্রশ্ন করেছিল, আপনার নেশা কি ?

রঙ্গলাল সেন বলেছিল, ভাত।

মানে ?

কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত। আমার প্রফেসান তো জানেন। রাত বারোটার আগে কোনদিনই ফেরা হয় না। তেমন-তেমন দিনে দেড়টা দুটো রাত হয়ে যায়।

তাই বলে ভাত! সুন্দর করে খোঁপা বাঁধা মহিলা হেসে ফেলেছিলেন।

হ্যাঁ। ভাত! অনেক ভাত খেলে তবে আমার গায়ে জোর পাই। বুদ্ধি খোলে।

কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু সেই ভাত গরম গরম রঙ্গলালের জোটে না। গরম ভাত, গরম ডাল, গন্ধ লেবু। একটা দারুণ জিনিস।

সেই ভাত খাওয়া এখন রঙ্গলালের বারণ। খেলেই সে আরও মোটা হয়ে যাবে।

কারণটা ঠিক এভাবে সাজানো দরকার। চুয়াল্লিশে পৌঁছে রঙ্গলাল সেন পেছনে তাকিয়ে যা মনে করতে পারে—তা অনেকটা এ রকম। সে নিজেই মনে মনে একখানা ডাইরিতে অদৃশ্য কালি দিয়ে এভাবে লিখে রেখেছে।

১৯৪০। ৮ জানুয়ারি।

ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হলাম। প্রথম বুঝতে পারছি—জীবনের চারদিকে গ্রামার, রুটিন, পরীক্ষা। জায়গাটা সুবিধার নয়। অনেকটা বাজে জিনিস মনে করে রাখতে পারলে তবে এখানে সুনাম হয়। আমার যে কিছুই মনে থাকে না। আমাদের ইতিহাস বইয়ের নাম পুরাবৃত্ত। ভূগোলের নাম সরল ভূজ্ঞান। আমি বড় হচ্ছি। আমাদের স্কুলের গায়ে নদীতে একদিন একটা জাহাজ এল। অন্য রকম চেহারা।

সম্ভবত ১৯৪৪। গরমকাল।

গান্ধীজীর স্ত্রীর মৃত্যুতে আমাদের স্কুলে স্ট্রাইক। টিউনিসিয়া ফিরে পাওয়ায় ব্রিটিশ সম্রাট একদিন স্কুল ছুটি দিয়ে বালুসাই খাওয়ালেন—ফ্রি। সঙ্গে একটা বাংলা সিনেমা। তাও ফ্রি। ছবিটার নাম—রাঙা বউ।

চলন্ত ট্রেনের জানলায় একদিন ইট মেরে ধরা পড়লাম। অপমানের

একশেষ। অ্যামেরিকান সোলজাররা জিপ্ নামে একটা ছোট মোটর-গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৯৪৮। মার্চ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আমি এবার লাস্ট হলাম।

১৯৫৩। শীতকাল

কলকাতার রাস্তায় আমি এখন একজন পরিব্রাজক। অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট। চাকরি পাই। আবার যায়। মেয়ে লোক, ফুটপাথের বৃষ্টিভেজা বকুল গাছ, শিশু, তরুণের হাসি—আলাদা করে সুন্দর লাগে। আরতি আর আমি—আমরা দুজন দুজনকে চুমু খেলাম।

আলাদা করে দুজনের সংসার পাতার একটা খরচ হিসেব করে দেখলাম। মোটামুটি থাকতে দুজনের পড়বে প্রায় সওয়া দুশো টাকা। আচমকা আরতি কেটে গেল।

দৈনিক প্রভাতের গোডাউনে বসে আছি। সকালবেলা। তিন-দিনের কাগজের জন্যে, রিল এসেছে লরি করে। সুন্দর গন্ধ। নেপা কাগজ বেরোবে আর ৩।৪ বছরের ভেতর। এখনো বেশির ভাগ কাগজ আসছে কানাডা থেকে। আজ বর্ষার ছবিটা পয়লা পাতার নিচের দিকে দিয়ে প্রভাত ঠিক করেনি। আমি যদি পাতা সাজাতাম—

রবীন্দ্র সরোবরে কি হয়ে গেল। গানের ফাংশনে মারামারি। পয়লা পাতার সবচেয়ে বড় খবর করে দিলাম। যা হয় হবে। রিডার নিশ্চয় বুঝবে—খবরটা কত ইম্পর্টান্ট।

ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আট কলমের ব্যানার খবর। মার্কিন প্রতিক্রিয়া এখনো জানা যায়নি। আজও বাড়ি ফিরে সেই কড়কড়ে ভাত খাবো। রুবি বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়বে।

এই গত বছরের কথা।

দৈনিক প্রভাত আনসোল্ড হয়ে ফিরে আসছে। টাউন কণ্ট্রাক্টর কাগজ ফেরত দিচ্ছে। গড়িয়াহাট সেণ্টারেই কাগজ কমেছে সতেরোশোর মত। ভাল খবর দিয়েও মার খাচ্ছি। প্রভাতের সেই ক্রেডিবিলিটি আর নেই। বাঁচবার রাস্তা বিজ্ঞাপন কমিয়ে নিউজ বাড়ানো। একথা ম্যানেজিং ডিরেকটরকে বলতে হবে। তাঁকে রাজী করাতেই হবে।

পেছন দিকে তাকিয়ে রঙ্গলাল সেন বুঝতে পারে—সে আজ পঁচিশ বছর—বিশেষ করে গত বছর থেকে অবিরাম চাপের নিচে থেঁতলে পড়ে আছে। পড়ন্ত প্রভাতকে চাঙ্গা করতে গিয়ে তাকে টেনশনের সঙ্গে পাশাপাশি থাকতে হচ্ছে। অনবরত চাপ। সংশয়। ভয়—হবে কি হবে না? এই তো তার জীবন এখন।

পরিণাম : এই চাপের দরুন রঙ্গলালের শরীরে কোন একটা গ্ল্যাণ্ডে জুস আর ক্ষরে না। ফলম্—সে একটু একটু করে মোটা হয়ে চলেছে। ভ্রূ উঠে যাচ্ছে। হাসলে গালের দুখানি পাঁউরুটি ফুলে ওঠে। কেউ এসে অপমান করলে রঙ্গলাল বুঝতে পারে। কিন্তু জবাব দিতে এত দেরি হয়ে যায় যে—অপমানকারী ততক্ষণে চলে গেছে। বিকেলের দিকে শীত করে তার। উপরন্তু তার হার্ট যতটা রক্ত পাম্প করতে পারে—তার চেয়ে বেশি পাম্প করতে গিয়ে ক্লান্ত। কারণ ওজনটা বেড়ে যাওয়ায় হার্টকে ওভারটাইম খাটতে হচ্ছে।

মেয়েরা স্কুলে। রঙ্গলাল তার বউকে বলল, চল বেড়িয়ে আসি।

এখন কোথায় বেড়াতে যাবে? এই দুপুরবেলা?

শ্রাবণ মাসে আবার দুপুর কোথায়? এই রোদ্দুর। এই বৃষ্টি। আমার তো বেরোনো হয় না। চল ঘুরে আসি রুবি। একটু রিলাক্স করা হবে।

মণি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে ওদের দুজনকে বারো মিনিটের ভেতর প্রিন্সেপ ঘাটে নিয়ে এল। গঙ্গার ওদিকটা একটু নির্জন ছিল। খেয়া লঞ্চ লাদাই হয়ে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যাচ্ছিল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে রঙ্গলাল বলল, নৌকো ভাড়া নেব? গঙ্গায় ঘুরবে?

ও-মা! বর্ষার নদীতে—আমি নামছি না। তার চেয়ে এসো না আমরা ওই বাঁধানো গাছতলায় বসি।

অনেকবার বসেছি রুবি।

পাতলা করে হাসলো রঙ্গলালের বউ। ওঃ! এসব জায়গা তো তোমার ঘোরা। সেবারে বক্রেশ্বর গিয়েও এরকম হয়েছিল। আরতির সঙ্গে এখানে এসেছিলে?

না।

তাহলে?

হয়তো মীরার সঙ্গে। এতদিন পরে মনে থাকে কারো! আমি তো সারা কলকাতায় হেঁটে বেড়াতাম।

দুজন আইসক্রিমওয়ালা অসময়ে এখন লাগদার খদ্দের ফেলে একই সঙ্গে ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তাদের নিরাশ করে মণির গাড়িটা স্পিডে বেরিয়ে গেল। ব্যাকসিটে সস্ত্রীক দৈনিক প্রভাতের নিউজ এডিটর। রঙ্গলালের তখন মনে হচ্ছিল—কি যেন একটা বই পড়েছিলাম—তার নাম ছিল বোধহয়—দি রিভারসাইড স্টোরি।

স্টোরিই বটে! মনে মনে নিজেকে বলল রঙ্গলাল। যতবারই রুবিকে নিয়ে কোথাও গেছে রঙ্গলাল—তখনই দেখা যায়—সে-জায়গা রঙ্গলালের আগেই দেখা। তাই শেষ অব্দি জমে না।

সকাল সকাল বেরোচ্ছিল রঙ্গলাল। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। গেটের মুখেই সুদক্ষিণার সঙ্গে দেখা। কোথায় যাচ্ছো?

স্কুলে। আপনি কোনদিকে যাবেন?

আমি এসপ্ল্যানেড হয়ে যাবো।

আমায় একটু নামিয়ে দিন না স্কুলে।

মণি গাড়ি চালাচ্ছিল। রঙ্গলাল বলল, আস্তে চালাও।

সুদক্ষিণা বলল, বেশ তো চালাচ্ছে।

না বেবি।

আমার ভালো নাম তো আপনি জানেন। সুদক্ষিণাই ডাকবেন।

রঙ্গলাল চোখ দিয়ে দেখলো সুদক্ষিণাকে। তিরিশ-বত্রিশ হবে। লিপস্টিক বুলিয়েছে ফিকে করে। ছাপা শাড়ি। তার সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। কাঁধ থেকে ঝুলছে ওয়ার্কিং গার্লের ব্যাগ। কাছাকাছি সময়ের ভেতর কোন একটা সিনেমায় যেন হিরোইনের কাঁধে এমন লম্বা স্ট্রাপের ব্যাগ ছিল।

তা তো ডাকবো। তোমার মধুর সঙ্গে আলাপ হলো।

বলেছে আমাকে।

তোমরা বিয়ে করে ফেলছো না কেন? টাইম কারও জন্যে ওয়েট করে না।

হো হো করে হেসে উঠলো সুদক্ষিণা।

খুব ভাল লাগলো রঙ্গলালের।

হাসছো যে—

আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে বলে—টেইমের কাজ টেইমে করবেন দিদিমণি।

তাহলে ছ্যাখো! আমি তো ভুল বলিনি।

ও-কথা থাক। মণিকে আস্তে চালাতে বললেন কেন?

ও কানে শোনে না। শুধু সামনেটা দেখে জোরে চালায়। পাশ থেকে লরি এসে ধাক্কা মারলেও শুনতে পাবে না।

লাইসেন্স পেল কি করে?

পেয়েছে। আমার মনে হয় বয়স বাড়িয়েছে। হার্ডলি আঠারো।

তাহলে তো রিস্কি ড্রাইভার।

ওসব কথা থাক বেবি—

সুদক্ষিণা বলুন। এত সুন্দর করে সাজলাম সকালে—

আমি তোমার হাতখানা একটু ধরে দেখবো?

ভাল লাগবে? দেখুন।

রঙ্গলাল হাতঘড়িসুদ্ধ সুদক্ষিণার কব্জি চেপে ধরলো তুহাতে।

সুদক্ষিণার কেমন সন্দেহ হলো, মণি গাড়ির আয়নায় হাসছে আর স্পিড বাড়িয়ে দিল।

ভাল লাগছে আপনার ?

মন্দ না।

তবু বলুন না। আপনি তো কাগজ চালান। কত ভাষা আপনাদের হাতে—

তুমি দৈনিক প্রভাত পড় ?

রবিবার রবিবার কিনি। এখন তো অনেক পালটেছে।

কাউকে পড়তে দ্যাখো ?

বাঃ ! খবরের কাগজ তো। অনেকেই পড়ে।

তবু তোমার জানাশুনো কাউকে পড়তে দেখেছো ?

অনেককেই।

যেমন ?

এই ধরুন—বিজলি। বিজলি মজুমদার—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কি একটা অফিসে রিসেপসানিস্ট। ও তো ব্যাগে করে দৈনিক প্রভাত নিয়ে অফিস যায় দেখেছি। হাতখানা সরাই এবার ?

রঙ্গলাল দেখলো, সুদক্ষিণার চোখে মুখে হাসি। বুঝতে পারলো, তাকে নিয়ে এই মেয়েটি মজা করছে। আসলে কি আমার বয়স বয়ে গেছে ? মনে এ-কথাটা আসতেই রঙ্গলাল নিজে থেকেই তার হাত তুখানা সরিয়ে নিল।

আপনার তো খোঁজে অনেক ছেলে থাকে—

আমি ঘটক নাকি ?

আমার জন্যে বলছি নে—

সুব্রত তো রেডি তোমার জন্যে।

কতটুকু জানেন আপনি ?

তাহলে আমার কোন চান্স আছে ?

আঃ ! থামবেন তো। স্কুলে পৌঁছে গেলাম যে ! আমার কথা

বলছি নে। বিজলির জন্যে একটি ভালো পাত্র দেখে দিন না। আপনার কাছে তো অনেকে আসেন।

আচ্ছা দেখবো। কেমন পাত্র চাই?

তা ধরুন ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়স হবে। বোকা বোকা যেন না হয়। আবার ওভার স্মার্ট—চালিয়াৎ পাত্রও চলবে না।

দৈনিক প্রভাতে পাত্রপাত্রীর কলম দেখেছো?

হ্যাঁ। আপনাদের কাগজে পাত্রপাত্রীর কলমে বেশি খবর তো থাকে না।

জানি। আমরা এমন একজন কাউকে খুঁজছি—যে বিয়ের বাজারের খবরাখবর লিখবে। একটা বেশ পাত্রপাত্রীর দফতর চালাবে। রসিয়ে লিখবে—পাত্রীর মনের কথা—পাত্রের চাহিদার হিসাব। গান, পড়াশুনো, রান্না, মনের খবরাখবর। তুমি লেখো না কেন সুদক্ষিণা?

আমি কি ছাই লিখতে জানি!

যদি পারতে—তাহলে এটা তোমার স্কুলের কাজের চেয়ে অনেক পেয়িং—অনেক ইণ্টারেস্টিং হতো কিন্তু। বিয়ের খবরাখবরের একটা দফতর চালাতে পারবে না তুমি?

দাঁড়ান, জিজ্ঞাসা করে দেখি।

তোমার বাবাকে বলে দেখো না?

উঁহু। বাবার কোন আপত্তি হবে না। একবার ওকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখবো।

মুখটা রীতিমত ম্রিয়মাণ করার ভান করলো রঙ্গলাল। তোমার ও কত ভাগ্যবান। সেই তুলনায় আমি—

আপনিও খুব ভাগ্যবান। রুবি বৌদির মুখে সব সময় হাসি। আপনাকে চালু রাখতে দেখি তো—আপনার যে-কোন আবদার সহ্য করেন।

রুবির সঙ্গে তোমার বুঝি খুব বনে?

বনবে না! মলির তো মা। কী সুন্দর স্কিন রেখেছেন গায়ের! কি ফিগার!

ফিগার কথাটা কানে যেতেই রঙ্গলালের চোখের সামনে রুবির কোমর, ব্লাউজে ঢাকা পিঠটা ভেসে উঠলো। ভেসে উঠতেই তার খুব আনন্দ হলো। আমি তো তাহলে বেশ তাড়াতাড়ি রিঅ্যাকট করি। ফিগার কথাটা কানে যেতেই ঝক্ করে চোখের সামনে রুবির পেট, কোমর—পিঠ, পরিষ্কার গলা—ভেসে ওঠা তো গুড্ সাইন। আমার গ্ল্যাণ্ড থেকে কি তাহলে মাত্রামত ক্ষরণ হচ্ছে? আমি কি তাহালে সেরে উঠছি? তাহলে তো ওজন কমে গিয়ে আমি আবার নর্মাল হয়ে যাবো। আগেকার মত দোহারা হয়ে যাবো। কেউ থ্যাঙ্ক য়ু বললে—সঙ্গে সঙ্গে থ্যাঙ্ক য়ু বলতে পারবো। একটুও দেরি হবে না। কেউ অপমান করলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দেব। একটুও দেরি হবে না। লেথারজি কেটে যাবে পুরোপুরি।

সুদক্ষিণা। একটা অনুরোধ রাখবে?

চুমু টুমু খেতে দিতে পারবো না কিন্তু।

পাগল হলে নাকি! তাই বলেছি নাকি? শুধু শুধু চুমু খেতে চাইবো কেন!

তবে?

আমায় একটু—থ্যাঙ্ক য়ু বল তো।

কেন? শুধু শুধু? ও হ্যাঁ। আপনি তো আমায় পৌঁছে দিলেন। থ্যাঙ্ক য়ু—

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গলাল সেন সুদক্ষিণার ডান হাতের চেটো হাতে নিয়ে চেপে ধরলো। থ্যাঙ্ক য়ু—

আঃ! ছাড়ুন। লাগছে—

হাত ছেড়ে দিতে দিতে রঙ্গলাল পরিষ্কার গলায় বলল, আমি পারছি। আমি তাহলে পারছি—

সুদক্ষিণা অবাক হয়ে তাকালো। একবার মনে হলো, পাগল টাগল

হয়ে যায়নি তো। এত কাছাকাছি কোন পাগলের পাশে বসে কোনদিন স্কুলে যায়নি। এই তো এসে গেছি।। মণি থামাও—

কেন? এখানে থামবে কেন? একদম তোমার স্কুলে দিয়ে আসি চল।

না না। এখানেই থামান। এটুকু তো আমি হেঁটে যেতে পারবো।

কোন দরকার নেই সুদক্ষিণা।

আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে।

আমি তো অফিসে যাচ্ছি নে এখন। এমনি ঘুরতে বেরিয়েছি।

ওঃ। বুঝেছি। তাহলে গাড়িতে যে—

কেন?

মলি বলেছে আমায় সব। আপনি এক একদিন এক একদিকে বেরিয়ে পড়েন। মানুষের মন জানতে। মানুষ কি চায়। কি তার চাওয়া উচিত। এসব নাকি পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে জানেন। ভারি মজার চাকরি আপনার।

কাজ করবে আমার সঙ্গে? পাত্রপাত্রীর খবর। মেয়েদের কলম। এখনকার প্রসাধন। সাজসজ্জা। ওয়ার্কিং গার্লের কথা লিখতে পারবে না?

রঙ্গলালের চোখের দিকে তাকিয়ে সুদক্ষিণা চোখ নামিয়ে নিল। এসে গেছি। এবার থামতে বলুন।

ঘণ্টা দেড়েক একটানা চালিয়ে মণি যখন একটা সরু পিচ রাস্তা ধরলো—তখনই রঙ্গলাল টের পেল, গঙ্গা এসে গেছে। লোকালয় কমছে। গাছগুলোর মাথার ওপরে দূরের আকাশে চিল। কোন নদীর কাছে এলে আকাশ বাতাস এমন হয়ে যায়।

তিন-চারটে বাঁক ঘুরতেই গঙ্গা বেরিয়ে গেল। সামান্য লোকালয়। দূরে একটা সাদা বাড়ির পা ছুঁয়ে নদীর জল খানিক খানিক ঢেউ ভাঙছে। ডিরেকশন মত রঙ্গলাল বুঝলো—বাড়িটা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। এই তাহলে ফলতা! বাঁ হাতে খানিক দূরে বিরাট জাল

শুকোচ্ছিল। আড়াআড়ি একখানা প্রাচীন কামানের নল সাজানো। তারই পাশে পুরনো ইটের গাঁথুনিতে তৈরি একটা পিলার।

সামনে নদীর বুকে এই বেলা দশটায় একখানা গোমড়ামুখো জাহাজ নোঙর করে দাঁড়ানো। আকাশে ছায়ার সঙ্গে বৃষ্টির মিশেল। জাহাজটা গম্ভীর মুখে কড়কড় করে শেকল ফেলছে জলে। রঙ্গলাল বুঝলো,—এটা একটা ড্রেজার। নদীর বুক কেটে মাটি তুলছে।

আজ রঙ্গলাল সেন এখানে এসেছে—দি রিভারসাইড স্টোরির খোঁজে। টাঙানো জালের সারি দেখেই বোঝা যায়—কাছাকাছি জেলেদের গাঁ। ছুশো বছর আগে আসা বিদেশী নাবিকদের বসানো কামানটা আজ অর্থহীন। জগদীশ বসুর বাড়িটা প্রায় নদীর ভেতর। মাছ মারাদের নৌকো চলেছে সারি সারি।

নির্জন নদীর ধার ধরে রঙ্গলাল এগোচ্ছিল। এমন বিষণ্ণ, গম্ভীর জাহাজ এত কাছাকাছি কোনদিন দেখেনি সে। নদী মানুষের এত কাছে। তাকে আমরা ভুলে থাকি। জলের নিচে আরো বড় একটা পৃথিবী আছে। জলের কথা, মাছের কথা, ছুই তীরের কাহিনী আমাদের রক্তে—অথচ কলকাতা নামে অতবড় গাঁয়ের মানুষের জন্যে দৈনিক প্রভাতে একটা কথাও থাকে না। থাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কথা। লালবাজার কন্ট্রোলের। হিরোইনের। আশ্চর্য !

দাদাবাবু—

রঙ্গলাল ঘুরে তাকালো। মণি তো কখনো তার এত কাছে আসে না। কি ব্যাপার ?

আমার চার হাজার টাকা লাগবে।

আয় করো।

ওরে বাপস্ ! অত টাকা আমি কোনদিন আয় করতে পারবো না। আপনি দিন। মাসে মাসে কেটে নেবেন।

অত টাকা আমার নেই। কি হবে অত টাকায় ?

আমার বাবার কথা তো জানেন। ট্রাফিকে পুলিস ছিল। চাকরি

ছেড়ে দিয়ে গাঁজা খায়। আয় করবে না। আমরা তিন ভাই কি কবে বড় হয়েছি—আপনি তো জানেন।

রঙ্গলাল ড্রেজারে মাটি কাটার ভারি আওয়াজ শুনতে পেয়ে নদীর দিকে তাকালো। মাঝগঙ্গায় ছায়ার ভেতর একটা অন্ধকার জাহাজ জলে শেকল নামিয়ে দিয়ে বিকট শব্দে নিচে নদীর বুক খাবলে খাবলে তুলে আনছিল।

মণিদের কথা সে জানে। মণির মুখেই শুনেছে। ছেলেটি তার বড় মেয়ে মলির চেয়ে দু-তিন বছরের বড় হবে। তার নিজেরও মণির বয়সী ছেলে হতে পারতো।

মণির বাবা গাঁজাখোর। উপায় করবে না কোন। মণিরা তিন ভাই মণি মেজো। ওরা তিন ভাই গ্র্যাণ্ড হোটেলের গাড়িবারান্দার নিচে শুয়ে থাকতো। বড় বড় লোকের গাড়ি মুছে দিয়ে পয়সা। বকশিশ। কাছাকাছি নিজাম থেকে রুটি কাবাব। আশপাশের শোরুম পাহারা দেওয়া বোম্বাইয়ের হিরো-হিরোইন এসে গ্র্যাণ্ডে উঠলে সবার আগে মণির তিন ভাই তাদের দেখতে পেত। মণির মুখেই রঙ্গলাল শুনেছে—বেশি রাতে ট্যাক্সিওয়ালাদের গাড়ি ব্যাক করে রাখতে গিয়ে সে গিয়ার, ব্রেক অ্যাকসেলারেটর চিনে চিনে একদিন গাড়ি চালানো শিখে ফেলে।

একখানা ফিয়েট দিয়ে ড্রাইভারিতে তার হাতেখড়ি। সেখানে মাস চারেকের বেশি সে টিকতে পারেনি। তার পরে মণি রঙ্গলালের গাড়ি চালাচ্ছে।

এক একটা পার্টস ভাঙে মণি। সারানো হয়। দাম জানে না নাম জানে না। মিস্ত্রিরা ঠকায়। মণিটা বোঝে না। রঙ্গলাল বোঝে। মণিকে সে প্রায়ই বলে, পার্টসগুলো চিনে নে একটু।

রঙ্গলাল মণিকে বলল, ড্রেজার ছাখ। দেখেছিস কখনো? নদীর পেট পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

মণি নির্জন নদীতীরে কিছুই শুনতে পেল না। পরিষ্কার গলায় বলল

বাবা বাড়ির ট্যাক্স দেয়নি বারো বছর। আমাদেরও বলেনি। ছাদে ফাটল ধরেছে। সেই ঠাকুর্দার আমলে বানানো।

তোকে না বলেছিলাম—আমার কাছে এসে থাক। অত অভাবের সঙ্গে তুই যুদ্ধ করে পারবি না। একদিন হাত পা ভেঙে পড়ে থাকবি।

না। মাকে ফেলে আমি আসতে পারবো না।

আর তো দু ভাই আছে। তারা বাড়িতে থাকুক।

তারা তো গ্র্যাণ্ডে থাকে।

মণির কথা শুনে হাসিও পাচ্ছিল রঙ্গলালের। গ্র্যাণ্ডে থাকে! কত নম্বর স্যুটে! এসব কথা তার মনে মনেই থাকলো। মুখে বলল, রাতের বেলাটা তোর দু ভাই বাড়ি থাকতে পারে না?

রাতেই তো কাজ দাদাবাবু। বড় বড় সাহেব আসে যায়। হাওয়া খায়। আপনাকে সব বলতে পারবো না। কত মেম আসে যায়।

সবাই মেম?

খানিকক্ষণের জন্যে মণি গ্র্যাণ্ড হোটেলের গাড়িবারান্দার জগতে চলে গেল। তার মুখখানা বেলা দশটার মেঘলা আকাশের ছায়া থেকে কয়েক মিনিটের জন্যে ছাড়া পেল। সেখানে রূপকথার হাসি, মায়া— সব লেগে গেল। আমরা সুন্দর মেয়েছেলেকে মেম বলি দাদাবাবু। কালো শাড়ি। ফর্সা রং। উঁচু জুতো। দামি গাড়ি থেকে নামছে। উঠছে। ঠোঁট লাল। চোখে কাজল। হাসলে খুব সুন্দর দেখায়। একজন আমার ছোট ভাইকে একটা হাতঘড়ি দিয়েছিল। বকশিশ।

রঙ্গলাল আর কথা বাড়ালো না। সে জানে, মণি এই দুনিয়ার একজন অভিজ্ঞ মানুষ। কানে কম শোনে। তারপর এমনিতেই চুপচাপ থাকে। নয়তো সে যথেষ্ট বিদ্বান। গ্র্যাণ্ড হোটেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় নির্ঘাত হর্ন দেবে। অকারণেই। কারণ অবশ্য আছে। হর্ন শুনে তার দু ভাই গাড়িবারান্দা থেকে বেরিয়ে এসে হাসিমুখে হাত নাড়ে। জাঙ্গিয়ার মত করে হাফপ্যান্ট গোটানো তাদের। গায়ে গেঞ্জি। গলায় রুমাল। হাতে গাড়ি মোছার একটা লাল কাপড়।

একটা আস্ত নদীকে পেছনে রেখে রঙ্গলাল মণির কাঁধে হাত রাখলো। এভাবে এত অল্প বয়স থেকে তুই চার হাজার টাকার দেনা কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করতে পারবি ? এত অভাবের ভেতর ?

মণি রঙ্গলালের চোখে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। শুনতে পাগলের হাসির মত অনেকটা। অভাব তো চিরকাল থাকবে না দাদাবাবু। আমার ট্যাক্সি হবে একদিন। তখন সব শোধ হয়ে যাবে।

ট্যাক্সির কথা পরে। এই দেনা তুই শুধবি কোত্থেকে ? ধর যদি টাকাটা আমিই দিয়ে দি—

মণি রঙ্গলালের চোখের দিকে তাকালো। মুখখানা কিশোর। অথচ গম্ভীর। আমার তো বয়স কম। একশো টাকা করে শোধ করবো। দশ বছরে শোধ হবে না দাদাবাবু ?

তা হবে।

তখন ট্যাক্সি কিনবো।

টাকা ?

ভাড়া ট্যাক্সি কিনে সারিয়ে নেব একটু একটু করে।

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে। যা আয় করবি—তার সবটাই যাবে রিপেয়ারে।

এভাবে চালাতে চালাতে একদিন পয়সা জমবে। তখন নতুন গাড়ি কিনবো।

ততদিনে তো বুড়ো হয়ে যাবি।

না দাদাবাবু। আমার তো বয়স কম। তখনো অনেক বয়স পড়ে থাকবে।

এখন কত তোর ?

ফাগুন মাসে উনিশ পুরে যাবে—

ড্রেজারটা একটা ভোঁ দিয়ে শেকল গোটাতে শুরু করলো। তাতে ছায়া করে আসা আকাশ আরও থমথমে হয়ে গেল। পায়ের কাছে ভিজে বাতাসে বুনো গাছের চারা কাঁপছিল।

দশ বছরে দেনা শোধ। তারপর ভাড়া ট্যাক্সি কিনে সারানো। শেষে নতুন গাড়ি কিনবি। ততদিনে তো মরেও যেতে পারিস। অসুখ-বিসুখ আছে। অ্যাকসিডেণ্ট আছে—

না না। মরবো না দাদাবাবু। সব করেও তো আমার চল্লিশ বছর বয়স হবে না তখনো। তখনো আপনার চেয়ে ছোট থাকবো।

সে তো এখনো আছিস। কতদূর পড়াশোনা করেছিস?

ক্লাস টু। তারপর আর হয়নি।

একদিন তো বিয়ে করতে হবে তোর?

সে তো নিশ্চয় দাদাবাবু।

রঙ্গলাল বুঝতে পারছিল না—সে এই কিশোরের কথায় হাসবে না বয়সোচিত গম্ভীর মুখ নিয়ে চুপ করে যাবে। নিশ্চয় কেন রে—

সে একটা আছে দাদাবাবু।

আমায় বলা যায়?

গলগল করে বলতে লাগলো মণি। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। তখন মাঝগঙ্গাতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর শব্দ করে ড্রেজারটা শেকল গোটাচ্ছিল। আবার গুঁড়ো বৃষ্টি এল। অবিশ্বাস্য পরিবেশ। মণি বলে যাচ্ছিল। সে আগের বাবুকে ডায়মণ্ডহারবারে নামিয়ে দিয়ে বেশি রাতে ফাঁকা ফিয়াটখানা খালি রাস্তায় উড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসছিল। পেলানের কাছাকাছি এসে দেখে—একজন মেয়েছেলে তার হেডলাইটের ভেতর। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রেক কষলো। গাড়ি থেকে নামলো মণি। কলেজের মেয়ে হবে। আত্মঘাতী হবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। যদি লরি এসে তাকে চাপা দেয়। মুখে মদের গন্ধ। মণি জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে থানায় যাচ্ছিল। বেহালা থানার গেটে ঢুকতেই মেয়েটা চাঙ্গা হয়ে বসলো। বদনামের ভয়ে ঠিকানা বললো। সেই রাতে মণি তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। পরে তারই সঙ্গে ভাব হয়েছে তার। শেষে মণি বলল, জানেন দাদাবাবু—মেয়েছেলেটা গ্র্যাজুয়েট। বিয়ে হয় না। চাকরি পায় না। তাই মরতে গিয়েছিল।

সে জন্যে তুই ছাত্রবন্ধু কিনেছিস ?

কোথায় দেখলেন ?

কেন ? সামনের সিটে। তুই তো পড়িস বসে বসে।

একটু-আধটু না পড়লে কি কলেজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় ? একদিন আমিও কলেজে পড়বো।

রঙ্গলাল দেখলো, মণির চোখমুখ উৎসাহে ফেটে পড়ছে।

এত কাজ শেষ করে তারপর পড়াশুনো করবি ? বাড়ির দেনা চার হাজার শুধতে হবে। ভাড়া ট্যাক্সি সারানো আছে। তারপর টাকা জমিয়ে নতুন গাড়ি। কখন এতসব করবি মণি ? ততদিনে তো বুড়ো হয়ে যাবি। তখন কি আর তোর বিয়ের বয়স থাকবে ?

না না—থাকবে দাদাবাবু। আমার তো এখনো কম বয়েস।

মেয়ের তো বয়স বসে থাকবে না। তাছাড়া—

রঙ্গলাল গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে মণির তু চোখ একসঙ্গে কেঁপে উঠলো।

রঙ্গলাল বলেই ফেলল, গ্র্যাজুয়েট মেয়ে যখন—তাহলে তোর চেয়ে বয়সে বড়। বিয়ে হবে কি করে—

আমার চেয়ে বেঁটে দাদাবাবু। লোকে দেখে বুঝতে পারবে না।

রঙ্গলাল আর কথা বাড়ালো না। মুখে বলল, চল ফিরি এবারে—

ফাঁকা রাস্তায় কিলোমিটারের কাঁটা সত্তরে। রঙ্গলাল ভাবছিল—চার হাজার টাকা কোত্থেকে পাওয়া যায়। আরও ভাবছিল—এ কিশোরকে সে বোঝাবে কি করে—লম্বা আর বড়—এ তুটো কথার মানেই আলাদা। ওদের বিয়ের পর তুজনে পাশাপাশি হাঁটলে লোকে না বুঝুক—মণি তো বুঝবে—বয়সে বড়—অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্লান্ত—ততদিনে বৃদ্ধা ওই সঙ্গে বউয়ের সঙ্গে ঘর করা কি জিনিস। ততদিনে কেন ?—তার আগেই অবশ্য হিসেব কষতে কষতে মণিও বুড়ো হয়ে যাবে।

একবার রঙ্গলালের মনে হলো—হিন্দী ছবির পোকা—মণির

পক্ষে এ গল্প চোলাই করাও কঠিন নয়। তবু ছেলেটার মুখচোখ এখনো এত সরল।

জোরে বৃষ্টি এসে গেল।

রঙ্গলাল বলল,আস্তে চালাও মণি। ওয়াইপার কাজ করছে না কেন?

বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টির শব্দের ভেতর মণি কি বলল, রঙ্গলাল তা শুনতে পেল না। দি রিভারসাইড স্টোরির খোঁজে এসে সে একটা টগবগে স্টোরি পেয়েছে। এই তো সাধারণ মানুষের কাহিনী। এই তো সাধারণ মানুষের খবর। সকালের কাগজগুলো কবে থেকে বিধানসভা, পার্লামেণ্ট আর রাজনৈতিক দলের ভেতরকার গসিপ ছাপানো বন্ধ করবে? কবে থেকে আমাদের নিউজপেপার একদম রাস্তার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর তুলে ধরতে পারবে? সাধারণের ভালবাসা, ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ কোন পথ দিয়ে যে দৈনিক প্রভাতের পয়লা পাতায় তুলে ধরা যায়—তা আমি জানি না। কিন্তু তুলে ধরতে হবেই—তা না হলে দৈনিক প্রভাত দাঁড়াতে পারবে না। সে খবরের কোথাও লেখা যাবে না—তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন—কিংবা গৌহাটি থেকে দিল্লি ফেরার পথে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাপক আমাশার দরুন—! এসব চলবে না।

রঙ্গলাল বুঝতে পারছিল তার আজকের সকালের অভিযান ব্যর্থ হয়নি। মণি স্বয়ং একটি স্টোরি। সাধারণের স্টোরি। এ-খবর সে নিজেই লিখবে। আজই অফিসে গিয়ে। কালকের সকালে কাগজে পয়লা পাতার ডানদিকে তিন কলম বক্স করে নামিয়ে দেবে। ষোল এম-এ কম্পোজ করে। তিন পয়েন্ট রুল চারদিকে। ছত্রিশ পয়েণ্টে এক লাইনের হেডিং—'আশা-নিরাশা'। আর কিছু বলার দরকার নেই হেডিংয়ে। বাকিটা পাবলিক পড়ে নিক। কাল বেলা দশটার ভেতর—মণি টক অব দি টাউন। নামটা পালটে দিতে হবে। গাড়ির নম্বর—বাড়ির ঠিকানা—বানিয়ে দিতে হবে। স্পেসিফিক। অথেনটিক। অথচ মণিকে যেন ধরাও না যায়।

বৃষ্টিটা ধরে এলো এবারে। রঙ্গলালের একটা কথা মনে হল। মণিদের মত কিশোর—যুবক—বয়স্কদের পক্ষে বিয়েটা এই বাজারে এক রকমের মহার্ঘ লাক্সারি। অথচ বিয়ের আগে কতই না সরল ছিল—সবার পক্ষেই। এখন এত কঠিন বলেই এত স্বপ্ন। স্বপ্ন বলেই—মণি হয়তো তাকে মুগ্ধ করতে আগাগোড়াই বানিয়ে বলেছে। আশ্চর্য! এত বড় একটা হিউম্যান স্টোরি তার সঙ্গে সঙ্গে—পাশে পাশে আছে—আর সে রিভারসাইডের সন্ধানে সত্যিই এত মাইল ছুটে একটা নদীর পাড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের খবরের—ওরফে আশা-নিরাশার সন্ধানে।

গাড়ির নিচে কলকব্জা নিয়মিত তালে কিচ কিচ শব্দ করছিল একটা—একই জায়গা থেকে। রঙ্গলাল শুনছিল—আমি নিই'চি—তুই দেখেচিস? সেই শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে তালে তালে বলতে লাগলো—আমি লোফার। আমি জাত লোফার। একথাটা তার আরও বেশি করে মনে হল—কারণ—রঙ্গলাল কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছে—কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে হলে জ্যামের ভেতর অসম্ভব তীক্ষ্ণ নার্ভ থাকা দরকার। যাকে বলে অ্যালার্টনেস। সেই ঝকঝকে নার্ভ আর রঙ্গলালের নেই। মাস-মাইনের বদলে সে মণির তাজা নার্ভগুলো কিনে নিয়েছে। তাই সে এত সহজে—এত তাড়াতাড়ি—ভিড়ের ভেতর দিয়ে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে।

৫

দৈনিক প্রভাতের অফিসে ঢুকতে দরজা একটা। সেখান থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক মিলিয়ে সাত-আটখানা কাগজ রিডারদের জন্যে নিয়মিত বেরিয়ে আসছে। ঢুকতেই লিফটের উল্টোদিকে ফাউণ্ডার-এডিটরের অয়েলপেন্টিং। তিনি বেঁচে থাকলে প্রায় দেড়শো বছর বয়স হত তাঁর। দেশসুদ্ধ লোক নাম জানে। ধার্মিক, দেশপ্রেমিক, তেজস্বী, অনাড়ম্বর সাদাসিধে মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি। একদা গান্ধীজী, তিলক—সবাই তাঁর বসবার ঘরের সামনের বেঞ্চে এসে বসেছেন। অপেক্ষা করেছেন বাইরে। ঘর খালি হলে তবে ভেতরে গিয়ে তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। বিদেশীদের অত্যাচারের খবর যোগাড় করতে তিনি চিঁড়ে গুড় নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। পায়ে হেঁটে তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরেকার দাম্ভিক, অত্যাচারী বিদেশী—ইংরেজ সাহেব—তাঁর কলমের এক এক খোঁচায় দাঁতনখসুদ্ধ সেদিনকার পাঠকের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এসবই এখন ইতিহাস। লাইব্রেরিতে বাঁধানো কাগজের পাতাগুলো তার সাক্ষী। তিলক, গান্ধীজী, নেহরু—যেখানটায় এসে বেঞ্চে বসেছেন—সেখানে এখন দু নম্বর টাউন কণ্ট্রাকটর আমরিক সিংয়ের হকারদের সাইকেল থাকে। সেদিনের একখানা থেকে এখন কাগজ দাঁড়িয়েছে সাত-আটখানা—সব মিলিয়ে !

এ জায়গা দিয়ে লিফটের পথে যেতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রোজ মনে হয়—আমি ইতিহাসের কয়েকখানা পাতা সরিয়ে রোটারি, টেলিপ্রিণ্টার, টেলিফোনের যুগে চলে এলাম।

বোর্ডের মিটিং ছিল সওয়া দশটায়। সিংহাসন মার্কা চেয়ারটায় তিনি বসলেন। এখন কনফারেন্স রুমের এয়ারকুলারগুলো বন্ধ। ক্ষণে

মেঘ, ক্ষণে রোদ্দুর—এ অবস্থাটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সহ্য হয় না। তিনি তাঁর বিখ্যাত বাবার মতই সাদাসিধে। ভেতরে গলাবন্ধ গেঞ্জি। তার ওপর পাঞ্জাবি। ভাগনেরা এয়ারকুলার চালু রাখলে তিনি একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে নেন। তাহলে পরে ঠাণ্ডা-গরমেও শরীরের কিছু খারাপ হবার উপায় নেই। বেলা সাড়ে তিনটেয় এক কাপ চা। চারটেয় বড় এক চামচ চবনপ্রাশ। এম. ডি-র মনে একটা দুঃখ, আমার অফিসাররা কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। লক্ষ্য তো আমাদের সবার এক। আমার বাবা এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। চালিয়াৎ হবার দরকার নেই। কিন্তু লাভ-লোকসান তো দেখতেই হবে। নইলে মাস গেলে এতগুলো মানুষের অন্ন হবে কোত্থেকে। সেজন্যে ঘাবড়ালে চলবে না! লম্বা সুতো দিতে হবে। সময় দিতে হবে। তাহলে সব কটা কাগজই নিজের জোরে এগোবে।

চিফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, সার্কুলেশন ম্যানেজার, কোম্পানি সেক্রেটারি, জেনারেল ম্যানেজার (বড় ভাগ্নে), ফাইনানসিয়াল কণ্ট্রোলার (মেজ ভাগ্নে), অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট ম্যানেজার (ছোট ভাগ্নে), তিনখানা ডেইলির তিনজন নিউজ এডিটর, তিনজন জয়েণ্ট এডিটর একে একে এসে বসতে লাগলেন। সবার শেষে এলেন পাবলিশার। তাঁর একটু আগে বোর্ডরুমে ঢুকলো রঙ্গলাল সেন।

সবাই একবার চোখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে। রঙ্গলাল মৃদু হেসে সবাইকে উইশ করলো। সেই ফাঁকে একবার সার্কুলেশন ম্যানেজারের হাতে মোটা ফাইলটাও একবার দেখে নিল রঙ্গলাল। নীহার দত্ত তার পুরনো পরিচিত। চাকরির বাজারে ঘুরতে ঘুরতে তারা এই মধ্যবয়সে এখন একই ছাদের নিচে এসে হাজির হয়েছে। ওই ফাইলে কি আছে, তা জানে রঙ্গলাল। তার জন্যে তৈরি করা কিছু মৃত্যুবাণ।

জোড়হাট থেকে রাঁচি, বাঁকুড়া থেকে বালেশ্বর—সব জায়গাতেই

একখানা-ত্বখানা করে দৈনিক প্রভাত রোজ কমে যাচ্ছে। এই খবরগুলো ওই ফাইলের ভেতর আছে। সুন্দর পেটানো স্বাস্থ্য। সুকুমার মুখখানি। সরল। পরিশ্রমী। সিধে মানুষ। কিন্তু কিছুতেই রঙ্গলালের যুক্তি বুঝবে না।

রঙ্গলাল বার বার বলেছে, প্রভাতের উইক সেণ্টারগুলোর নাম বলবে নীহার। তাহলে সেখানকার খবর পরপর সাতদিন ঠেসে দিয়ে যাবো। উইক পয়েণ্ট—স্ট্রং পয়েণ্ট হয়ে দাঁড়াবে।

নীহার বলেছে, সব জায়গাতেই উইক।

তবু উইকের ভেতর বেশি উইক জায়গা?

সবই সমান।

রঙ্গলাল বুঝেছে, নীহারকে বলে লাভ নেই। নীহারকে বললে অনেকক্ষণ ধরে বলা যায়। কিন্তু তাতে ওর সঙ্গে তর্ক করতে হবে। এম. ডি-কে বলে সেণ্টারগুলোর সেলস ফিগার নিতে হবে। সেটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। তার চেয়ে সোজা পথই ভালো। সাধারণের খবর। সাধারণের সঙ্গী হয়ে দৈনিক প্রভাত একটু একটু করে এগিয়ে চলুক। একদিন ফল পাওয়া যাবেই।

বড় ভাগ্নে বলল, তাহলে নেট রেজাল্ট কি দাঁড়ালো রঙ্গলালবাবু—

রঙ্গলাল চোখ তুলে তাকালো। নীহার উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই অবস্থায় এম. ডি-র দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা গাঁয়ের খবর বেশি করে দিতে গিয়ে হাতের কাছে সিটির রিডার হারাচ্ছি। আবার সিটির গাড়িঘোড়া, হাসপাতাল, এডুকেশনের স্ট্রং ক্রিটিসিজম্ করে কনভেনশনাল সরকারী বিজ্ঞাপনও হারাচ্ছি।

রঙ্গলাল ঠাণ্ডা গলায় বলল, প্রভাতকে তার এক নম্বর জায়গা ফিরে পেতে হলে এ ঝুঁকি নিতেই হবে। এখন আমরা কিছু কিছু জিনিস হারবো ঠিকই। কিন্তু যখন ফিরে আসবে—তখন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসবে। চাইকি তিনগুণ।

এম. ডি. সব শুনছিলেন।

নীহার বসে বলল, মেয়েদের পাতায় সুদক্ষিণার কলম মেয়েদের আদৌ ভালো লাগছে না। খারাপ চিঠি আসছে।

মেজো ভাগ্নে বলল, ওর ভেতর আছে কি? পর পর চার উইক একই সাবজেক্ট-এর ওপর শুধু ভ্যানভ্যান করছেন সুদক্ষিণা।

রঙ্গলাল বলল, পাঠক তো রিঅ্যাক্ট করছে। এরপর ভালো চিঠিও আসবে। দেখবেন আপনি।

নীহার বলল, আমাদের মাঝে মাঝে ভালো ফিচার স্টোরি দেওয়া দরকার।

রঙ্গলাল এবার নীহারকে তার নিজের কোটে পেল। আস্তে জানতে চাইলো, দৈনিক প্রভাত এখন ডেইলি পেপার হিসেবে কেমন?

ভালো। কিন্তু আমরা আগের রিডার হারাচ্ছি। নতুন রিডার আসছে না। অথচ জিনিসটা আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে।

তা হচ্ছে। একশোবার বলবো—ভালো কাগজ করতে গেলে এমনই করা উচিত। অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির লোকজন কমপ্লিমেণ্টারি কপি আরও চাইছেন।

তাহলে নীহার—ভালো কাগজ হচ্ছে। গুণী লোকেরা আরও কাগজ চাইছেন।

নিশ্চয়।

তবে তুমি বেশি করে মারকেট করতে পারছো না কেন? বিজ্ঞাপনই বা আরও আসছে না কেন?

বিক্রি কমছে বলে। বাড়ছে না বলে।

বিক্রির ভার তো তোমার ওপর। আমার ওপর ভার—ভালো করার।

পাবলিকের টেস্ট কোন্‌দিকে—তাও তোমায় দেখতে হবে। ডেলির পাতায় আরও ভালো স্টোরি চাই।

স্টোরি কোথায় পাবো? এতদিনের দৈনিক প্রভাত আজও একজন লেখক তৈরি করতে পারেনি। আজও লেখার বাজারে আমরা খদ্দের

মাত্র। টাকা ফেলে লেখা কিনি। তার চেয়ে কি ভালো লেখক তৈরি করে দৈনিক প্রভাতের ছাপা দিয়ে বাজারে ছাড়া যায় না? তাহলে পাঠক একদিন আমাদের বিশ্বাস করবে। দৈনিক প্রভাত তার মর্যাদা ফিরে পাবে। নইলে চিরকালই আমরা খদ্দের থেকে যাবো।

কিন্তু রঙ্গলাল—একটা কথা শোন—আমাকে তো নিউজপ্রিন্টের টাকা দিতে হবে। মাস গেলে যা যা দরকার—তার ব্যবস্থা করতে হবে। পড়তি বিক্রি নিয়ে আমি সামলাবো কি করে?

নীহারকে থামিয়ে এবারে পাবলিশার মুখ খুললেন। তিনি নিউজপ্রিন্টের মিটিংয়ের জন্যে প্রায়ই দিল্লি বোম্বাই করেন। গত তিরিশ-বছর ধরে কাগজের পোকা। হেসে বললেন, আমার মনে হয় কিছুটা সময় লাগবে। রঙ্গলালবাবুর নিউজকেটারিংয়ের দরুন আমাদের আগের পাঠক কিছু ছেড়ে যাবেই। যেতে যেতে এক জায়গায় গিয়ে সার্কুলেশনের ড্রপ থামবে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে রঙ্গলালকে ফাইট দিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকেই দৈনিক প্রভাতের ওপরে ওঠার পালা শুরু হবে।

কথাবার্তার এ-জায়গায় এম. ডি. চায়ের কথা তুললেন। সবাইকে বুঝে নিতে হল—তিনি আলোচনার ইতি এখানেই চান। অতএব নীহারকেও থেমে পড়তে হল।

রঙ্গলাল বলল, আমায় কেউ মেয়েদের কলম লেখার লোক দিতে পারেন? ঘরোয়া কথা, ফ্যাশন, কসমেটিকস, রান্নাবান্না, ওয়ার্কিং গার্লের খবরাখবর রসিয়ে লিখতে পারলেই হল। সুদক্ষিণার কলম যদি পপুলার না হয়—

পাবলিশার বললেন, চালিয়ে যান। লিখতে লিখতে পালটাবে। সমালোচনা থাকলে সে চিঠিও কলমে পাশে ছেপে দিন। পাঠক তার মতামত প্রকাশ করতে পারলেই খুশী হয়। আমাদের তো সে মতামতকে গুরুত্ব দিতেই হবে—

রঙ্গলাল বুঝলো, সে এখন নিউজপ্রিন্টের জঙ্গলে বসে আছে। ছাপা লেখার জগতে সবচেয়ে স্বল্পায়ু—সবচেয়ে প্রচারিত জিনিসের নাম

খবরের কাগজ। ব্যাপারটাই সারকাসে দড়ির খেলা। এদিক-ওদিক হলেই পড়ে যেতে হবে। অথচ এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাওয়া দরকার।

মলি পড়তে বসে সকালবেলাতেই খুশির প্রেমে পড়ল। চারটি পা গুটিয়ে বাঘের বাচ্চা হয়ে বসে আছে। মলিকে তাকাতে দেখে সে হাই তুলে হাসলো। এখন তার বাড়তির বয়স। এ-বেলা ও-বেলা মিলিয়ে ছখানা রুটি খায়। তাছাড়া কিমা-মেশানো ভাত তো আছেই।

ললি ছিল টেবিলের ওপাশে। সে বলল, দিদি—এখন আর কুকুর ঘাঁটিস নে। বাবা দেখলে পেটাবে।

কেন? রেগে আছে?

হ্যাঁ। আবার সার্কুলেশন পড়ে গেছে।

আরও পড়বে দেখিস। আমার গায়ে হাত দিলে দৈনিক প্রভাত উঠে যাবে।

ও-কথা বলিস না দিদি। বাবা কত খাটছে ছাখ।

খেটে কি করবে। লাল কাগজ ভুল ছাপা।

ভুল তুই বুঝিস দিদি!

বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না দেখছি। মারবো এক চড়।

ক্লাস টেনে পড়ে মলি। ললি পড়ে সেভেনে। একটা অগোছালো টেবিলের দুধারে ওরা বসে ছিল। পায়ের নিচে খুশি আপন মনে চেয়ারের পা কামড়াচ্ছিল।

মলি মুগ্ধ। খুশির রূপে। হঠাৎ টেবিলের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে খুশিকে জড়িয়ে ধরলো। ওরে কচিরে। কচি আমার—

ললিরও ইচ্ছে করছিল—খুশিকে সে কোলে নেয়। এত বুঝদার কুকুর দেখা যায় না। কিন্তু ও-ঘরে বাবা একটু আগে মায়ের সঙ্গে তাদের হ্যাফইয়ার্লির খবরাখবর নিচ্ছিল। ললি একটু সাবধানী। সে দিদির

মত রাস্তা দিয়ে যাওয়া আইসক্রিমওয়ালা ডালপুরিওয়ালার কাছে কখনো বাকি খায় না। তাই পাওনাদারের ভয়ে তাকে কখনো লুকোতেও হয় না। সে আস্তে বলল, দিদি। টেবিলের নিচে থেকে উঠে আয়। বাবা দেখলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না। তুজনেই মার খাবো।

মলি তখনো কচি-রে-কচি করে যাচ্ছিল। ললির কথায় উঠে দাঁড়ালো। ভার্ব কাকে বলে জানিস?

এ কি দিদি! আর ক'দিন পরে তুই ফাইনাল দিবি। ভার্ব জানিস না?

পাকামি করতে হবে না দিদির সঙ্গে। এখন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পগুলো যা পড়বি—আমায় ছোট করে মুখে মুখে বলে দিবি। নয়তো অসুবিধায় পড়বি—

তুই নিজে পড়লে পারিস দিদি।

অতখানি পড়া যায়! তুই যা যা পড়বি—আমায় ছোট করে বলবি।

দিদির জন্যে ললির খুব মায়া হল। আস্তে বলল, হাফইয়ার্লি পরীক্ষার প্রোগ্রেস রিপোর্ট আনিসনি কেন দিদি?

দেবে না। গার্জেনকে দেখা করতে বলেছে।

আবার ফেল করেছিস?

তাতে তোর কি?

বাবাকে বলেছিস?

না। মা জানে।

আবার কিন্তু অশান্তি হবে দিদি।

সে আমি বুঝবো। বাবা বেরিয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে সিনেমায় যাবি?

আজ শুক্কুরবার। আজই ছবি শুরু হচ্ছে। আজ কি করে টিকিট পাবি দিদি?

বিশ্বনাথ দিয়ে যাবে বলেছে—

ব্ল্যাকে ?

ব্ল্যাকে মলি সেন টিকিট কাটে না।

বিশ্বনাথ যে টিকিট দিয়ে যাচ্ছে—মানেটা বুঝিস দিদি! ও কিন্তু তোর ফ্যান্।

পাকামো করিস নে। যাবি তো রেডি থাকিস।

পয়সা পেলি কোত্থেকে ?

বাবা সংসার চালাবে বলে নিজের কাছে যে টাকা রেখেছে—সেখান থেকে দুখানা দশ টাকার নোট সরিয়েছি।

যদি টের পায় ?

পাবে না। সব সময় তো দৈনিক প্রভাত আর স্টোরি নিয়ে আছে। দেখিস না! মাকে নিয়ে একদিন সিনেমায় যায় ? বেড়াতে যায় ? আমি ওপরে যাচ্ছি। বাবা খুঁজলে বলবি অঙ্কের খাতা আনতে গেছি।

সুদক্ষিণাদির ওখানে এখন আড্ডা দিতে যেও না দিদি। তার লাভার সুব্রতদা এখন আসবে কিন্তু!

বেশি পাকা হয়েছিস। মারবো এক চড়। মধুদা আমাকে খুব লাইক করে জানিস। এখুনি ঘুরে আসছি।

দিদি চলে যেতে ললি তার স্কুলের ব্যাগ খুললো। অনেক কাজ জমে আছে। ক্লাস সিক্সের শোভনা তাকে খুব ভালবাসে। রোজ তার জন্যে টিফিন আনে বাড়ি থেকে। আজ সে শোভনার জন্যে একখানা গল্পের বই নিয়ে যাবে। বাবা তো কত বই পায়। তার একখানা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। এই খুশি, কি হচ্ছে ?

খুশির জন্যে মনটা তার দুর্বল হয়ে পড়লো। এমন করে তাকায় তার দিকে! যেন কেউ নেই ওর। এখন ললির ভূগোল পড়ার কথা। তার বদলে সে উঠে গিয়ে জগৎ ডাক্তারকে ফোন করলো।

ডাক্তারবাবু তার গলা চেনেন এখন। কি খবর ললি ? খুশি কতটা বড় হল ?

বড় হয়েছে ডাক্তারবাবু। কিন্তু ছাড়া থাকলেই নিজের স্টুল খেয়ে ফেলে।

তবে নিয়ে এসো।

আপনি তো ওকে পেলেই ইঞ্জেকশন দেবেন। কষ্ট পায়। অথচ স্বভাব পাল্টায় না।

তোমরা তো ট্রেনিং দাও না। আদর দিয়ে বাঁদর বানাচ্ছো। নিয়ে এসো। না হয় আমার হস্টেলে রেখে যাও ক'দিন।

থাকতে পারবে দিদিকে ছেড়ে?

তাও তো বটে। আচ্ছা নিয়ে এসো তো। দেখি একবার।

মণি এসে গাড়ি নিয়ে এলো গ্যারাজ থেকে। মায়ের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলো, বাবা আজ বিকেলের আগে বেরুচ্ছে না। তাছাড়া হয়তো আজও বাবা 'অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের' জন্যে একা ট্রামে-বাসে— পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারে। খুশিকে কোলে নিয়ে ললি গাড়িতে উঠলো।

রনি নার্সিং হোমের সামনে এখন রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে। দেওয়ালটাও ডাক্তারবাবু নতুন করে গেঁথে রং দিয়ে নিয়েছেন। ভেতরে ঢুকে ললি বলল, মণিদা, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি তো দিদি ছাড়া কোনদিন আসিনি এখানে।

বেলা ন'টা সওয়া-ন'টা হবে এখন। নার্সিং হোমে কোন কুকুরের ঘেউ ঘেউ নেই। চারদিক নির্জন। খুশি ফাঁকা বাড়ি পেয়ে তুরতুর করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই ও-টি-তে যাবার সিঁড়িতে উঠে পড়ে। আবার নেমে গিয়ে ডাক্তারবাবুর কাউন্টারে ঢুকে পড়ে। এক খেলা পেয়ে গেল।

মণি সাহস করে একটু এগিয়ে পাশের বড় হলঘরে পা দিল। এটাই তো হস্টেল। আশ্চর্য! সব ক'টা খাঁচা ফাঁকা। ললিদি? কোথায় গেল সবাই?

খুশি সে ঘরে ঢুকে পড়েই পাশের সিঁড়ি দিয়ে পাশের মাঠে নেমে

পড়লো। তার পেছন পেছন ওরা দুজন নেমে পড়লো মাঠে। বাড়িটার পেছনে যে এত জায়গা আছে—বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আরেকটু এগিয়ে খুশি সমেত ওরা তিনজনই দাঁড়িয়ে পড়ল। নানা জাতের প্রায় ডজনখানেক কুকুর নিয়ে জগৎ ডাক্তার চোর চোর খেলছেন। একটা কাঠের বল দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সব ক'টা কুকুর একসঙ্গে তা আনতে ছুটছে। আর সেই ফাঁকে ডাক্তারবাবু পুরনো আমলের এই বাড়িটার পাটাতন, মোটা দেওয়াল, সিঁড়ির আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছেন। আর ওরা জনা বারো তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষে বের করছে। চারদিকে আনন্দের ঘেউ ঘেউ। নানা জাতের গলা। এ-খেলা দেখে খুশিও তাতে ভিড়ে গেল। ওরা কোন বাধা দিল না। কিন্তু খুশিকে দেখে জগৎ ডাক্তার এদিকে তাকালেন।

কখন এলে ললি। ওদের একটু ব্যায়াম করাচ্ছিলাম। তোমার খুশি তো বড় হয়েই উঠেছে।

বড্ড ও খায় ডাক্তারবাবু।

তা খাক একটু। তোমরা কি শিশু বয়সে খাওনি ?

সবার নজরে পড়লো খুশিকে পেয়ে বাকি প্রবীণ কুকুরগুলো মজার খেলা পেয়ে গেছে। তাকে ঘিরেই আনন্দের দৌড়াদৌড়ি চলছে। ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ তা দেখে ললিকে বললেন, ওকে নিয়ে আসবে এখানে। মন ভালো হয়ে যাবে খেলাধুলো করে। ও খাওয়ার নাম করবে না আর।

দিদি ওর নাম দিয়েছে মিস গুখেকি সেন।

খুব রসিক হয়েছে তো তোমার দিদি। খুশি যদি মানে বুঝতো—তাহলে কিরকম ব্যথা পেতো মনে ভাবো তো।

নার্সিং হোম থেকে ফেরার পথে ললি পেছনের সিটে খুশিকে নিয়ে বসতে গিয়ে সামনের সিটে দেখলো, অনেকগুলো বই-খাতা। কিছু হাতের লেখা মক্‌শো করার কাগজ। একখানা শ্লেট ! খুশিকে জাপটে ধরে ললি জানতে চাইলো, এসব কার মণিদা ? খাতা ? বই ?

গাড়ি চালাতে চালাতে পাশের গাড়িগুলোকে অপমান করছিল মণি। একটু ফিকে মত হেসে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে ভিড়ের ভেতরেই টপ গিয়ারে তুলে নিল গাড়িটাকে, আমার। আমি পড়াশুনো করছি।

কেন? কি হয়েছে তোমার মণিদা?

কি আবার হবে! মানুষ পড়ে না?

ললি শুনে চুপ করে গেল। তারপর বলল, কার কাছে পড়ছো?

চল্লিশ টাকা দিয়ে মাস্টার রেখেছি। তাড়াতাড়ি শেখাবে—

তোমার অ্যাতো কষ্টের চল্লিশ টাকা এভাবে নষ্ট কোরো না মণিদা। বই-খাতা এনো। আমি আর দিদি মিলে থ্রি-ফোর অব্দি পড়াতে পারবো।

তোমাদের তো নিজেদেরও পড়াশুনো আছে। সময় কোথায় তোমাদের?

ওরই ভেতর সময় করে নেবো।

না না। পড়াশুনো ওভাবে হয় না। আমি তো আজকাল ভোরে উঠে পড়তে বসি।

বাবাকে নিয়ে অত রাতে বাড়ি ফিরেও?

যত রাতেই ফিরি না কেন—পড়াশুনো তো ভোরেই করতে হয়। তা না হলে তো মনে থাকবে না। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে বসি।

তোমার এখন পড়ে কি হবে মণিদা?

আছে। অনেক কিছু আছে। বলবো না তোমায় ললিদি।

আমায় বলে ছাখো আমি কাউকে বলবো না।

সত্যি?

তিন সত্যি।

আমি বিয়ে করবো। পাস করা মেয়ে। গ্র্যাজুয়েট। বুঝলে তো!

বি. এ. পাস? সে তোমার সঙ্গে বিয়েতে বসবে কেন?

বসবে। বসতে হবে তাকে। আলবৎ বসবে—

এই মণিদা। আস্তে চালাও! মিনিবাসটা যদি গুঁতো মারতো!

অত সোজা নয়। আমি সময় মত কেমন কাটিয়ে নিলাম। তা তো বললে না—

তুমিও তো বলনি—কেন বিয়ে করবে?

আলবৎ বিয়ে করবে কমলা। সেদিন বেপাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল। অন্যায়। গেটে ধরলুম। ছেলেটাকে এমন প্যাঁক দিলাম—সারাজীবন আর আমাদের পাড়ামুখো হবে না। কমলা তো কেঁদেকেটে একশেষ—

সারা জুন মাসে তিন তিনবার বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলো। কলকাতার রাস্তাঘাটের কামানের গোলা খাওয়া চেহারা। তাতে অনবরত বৃষ্টি। কাদা। বাস নেই। ট্রাম অচল। তার ভেতর কোথাও কোথাও আবার লোডশেডিং। তিন কলম জুড়ে তিনদিন খবর হল। সরকারী স্টেটমেণ্ট। আগের সরকারের অকর্মণ্যতা। বৃষ্টি থামলেই কি করা হবে—তার ঢালাও বিবরণ—ছেপে ছেপে দৈনিক প্রভাত যখন হয়রান—তখন দেখা গেল—এত কাণ্ডের পরেও সিটিতে কমেছে হাজার দেড়েক। মফস্বলে আটশো। দিন চারেকের তফাতে আবার নিম্নচাপ, আবার বৃষ্টি আর লোডশেডিং। নিজে যা বুঝলো—সেই মত এক রিপোর্ট লিখে রঙ্গলাল হেডিং দিল—প্লাবনের কিনারে।

পরদিন দুপুরে অফিসে ঢুকতেই শুনলো, টাউনে দৈনিক প্রভাত আর পড়েনি। বরং আচমকা তিনশো বেড়েছে।

খবরটা দিয়ে সার্কুলেশন ম্যানেজার হেসে বলল, টাউনে ফ্লাইং কাস্টোমার হাজার দুয়েক সব সময়েই থাকে। কি আর করবে! বর্ষা বাদলার দিন। তারা সবাই কাগজ কিনে কিনে পড়েছে। আমাদেরই শুধু বাড়েনি। ওদেরও বেড়েছে।

রঙ্গলাল জানে, 'প্লাবনের কিনারে' রিপোর্টটায় জলবন্দী ব্যতিব্যস্ত

গেরস্থ মানুষের কথা লিখেছে বলেই সাধারণের সঙ্গী হতে পেরেছে প্রভাত—অন্তত খানিকটা। সেকথা মনে রেখেই রঙ্গলাল বলল, এই বৃষ্টিতে এত ফ্লাইং কাস্টোমার কি থাকে?

তা থাকে।

ওদেরও ছিল?

তা তো থাকবেই।

ওদের মানে—শহরের আরেকখানা দৈনিক। যার পয়লা পাতায় খবরের ছড়াছড়ির ভান থাকে। ভেতরটা ফাঁপা। রঙ্গলাল ভাবলো একবার বলে—তাহলে হিসেব মত কাস্টোমার যে ভাগ হয়ে যায়। এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। তার স্থির বিশ্বাস, দৈনিক প্রভাত এবার পড়তি চাকার স্পোক ধরে ওপরমুখো হবে। তারপর একদিন ঝাঁকুনি দিয়ে বাড়তে থাকবে। সেই পয়লা ঝাঁকুনির দিনটার অপেক্ষায় আছে রঙ্গলাল। তার আগে মন খুলে একটি কথাও বলবে না সে।

অনেকদিন পর প্রায় সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ি ফিরে রঙ্গলাল রুবিকে অবাক করে দিল। খেতে দাও। মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবো। ও দুটোকে ডাকো।

ওরা এখন আসবে না তোমার সামনে।

কি ব্যাপার?

হাফইয়ার্লির প্রোগ্রেস রিপোর্ট আনতে বলেছিলে—

রুবির দিকে তাকালো রঙ্গলাল। রাগে তার রি রি অবস্থা। এবারও ফেল করেছে? দুজনেই? ক'টা করে সাবজেক্ট? মা হিসেবে ওদের জীবনে তোমার কোন রোল নেই? মাস্টারমশাই পড়িয়ে চলে গেলেন—আর ওরাও উঠে পড়লো! আমার নেই দেখবার সময়। তুমি কি কিছুই দেখতে পারো না? কাজের লোক তো রয়েছে বাড়িতে।

আমার কথা শুনলে তো!

তুমি ওদের মা না? একটানা কথা বলে হাঁফাচ্ছিল রঙ্গলাল। তুমি

ওদের নিয়ে বসতে পারো না? আমি থাকি অফিসে। আর তুমি বাজার ঘুরে ঘুরে কেটলি কিনবে! ফুলঝাঁটা কিনবে। লুধিয়ানায় চিঠি লিখবে।

যে-বাটিটায় ডাল দিয়েছি—ওটা তো লুধিয়ানার টিকিট কিনেই পেয়েছিলাম। সংসারে লাগে না?

ফেলে দাও ও বাটি। মেয়ে দুটোকে ডাকো।

ডাকবো কি! ঘুমোচ্ছে তো। সন্ধ্যে সন্ধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোচ্ছে।

ভাত ফেলে উঠে দাঁড়ালো রঙ্গলাল। কোথায় ঘুমোচ্ছে? দেখি। নিশ্চয় মটকা মেরে শুয়ে আছে। মাস গেলে অতগুলো টাকা মাস্টার মশাইকে দিতে হয়। কাল মাস্টার মশাইকে আসতে বারণ করে দাও। খারাপ স্টুডেন্ট পড়িয়ে ভদ্রলোকের শুধু শুধু নাম নষ্ট হবে কেন?

মলি ললির ঘরে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল রঙ্গলাল। দু বোন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে! তাদের মাঝখানে জেগে বসে আছে খুশি। পাহারাদারের ভঙ্গীতে ছোটখাটো বাঘের পোজে। রঙ্গলালকে দেখে সে দিদিদের পায়ে দিকে চলে গেল।

রঙ্গলাল আরও রেগে গেল রুবির ওপর। রাতে বেঁধে রাখো না কেন?

কথা শুনলে তো। মলি শোবার সময় চেন খুলে দেবে রোজ।

একটু কথাও মেয়েদের শোনাতে পারো না? এ কথাও আমাকে দিয়েই শোনাতে হবে! কুকুরের চোখের একরকমের পোকা রাতে মেয়েদের চোখে গিয়ে পড়লে জীবনের মত অন্ধ হয়ে যাবে।

রুবি কোন জবাব না দিয়ে খুশিকে খাট থেকে নামিয়ে দিল।

রঙ্গলাল কাছে গিয়ে দেখলো, মলির সারা মুখে নানা রকমের রঙ এগুলো মেখেছে কেন?

রুবি হাসি চেপে বলল, কোন্ ইতিহাস বইতে পড়েছ—মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে আদিবাসীরা তার মুখে, গায়ে রঙ দিয়ে ছবি এঁকে দেয়—

তাই ফেল্ট্ পেনের সব ক'টা খরচা করে মুখে মাখিয়েছে ললিকে দিয়ে—

আর কিছু বলতে পারলো না রঙ্গলাল। জানে—তুজনেই পরীক্ষায় ফেল। বিদ্যাসাগরকে বেটে খাওয়ালেও পাস করবে না ওরা। হাসি আসছিল। রাগও হচ্ছিল। কিন্তু ঘুমন্ত সন্তানকে জাগিয়ে লাভ নেই এখন।

মলি-ললি আজ তিন বছর গুরু হরি সিংয়ের কাছে মণিপুরী শিখছে। গুরু বলেন, মলির নাচে বেশ গ্রেস আছে। নাচলে নাকি হবে। সেই সুবাদে গুরুজী মণিপুর থেকে মৃদঙ্গ আনিয়েছেন। মলিকে-ললিকে নিয়ে রুবি টাকা দিয়ে মৃদঙ্গটা আনতে গেছে।

সন্ধ্যেবেলা। পার্লামেণ্ট বন্ধ। কোন বড় খবর নেই। রাইটার্সের মন্ত্রীরা টাকা চাইতে সবাই দিল্লি গেছে। নৌকাডুবি, ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্ট, আত্মহত্যা কিংবা দলত্যাগ—কোন খবরই নেই। রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে রঙ্গলাল দেখলো, বাড়িতে লোক বলতে কাজের মেয়েলোক —বয়স্কা কুন্তি আর খুশি রয়েছে। কুন্তির নাতি-নাতনী হয়ে গেছে দেশে। সে খুশিকে নিজের মেয়ের মত দেখে। তাকে চেনে বেঁধে পায়চারি করাচ্ছে। যাতে হজম হয়ে খুশি রাতের তুধ-রুটি খেতে পারে।

দাদাবাবুকে দেখে কুন্তি চা করে এনে দিল তাড়াতাড়ি।

গোটা তিরিশেক টাকা দিতে পারো কুন্তি? কাল দিয়ে দেব। কিংবা বৌদি ফিরলেই দেব।

তা দিতে পারি। কিন্তু তু'টাকা সুদ দিতে হবে দাদাবাবু।

দেব।

টাকা দিয়ে কুন্তি বলল, কি করবে? আবার মদ খাবে তো!

ঠিক নেই। খেতেও পারি। নাও পারি।

টাকা তো তোমার কাছে ছিল দেখেছি। সংসার খরচের টাকা—

ছিল। সব খরচা হয়ে গেছে। বৌদি নিয়ে নিয়েছে। বলে

রঙ্গলাল মনে মনে একটা পুরনো অঙ্ক কষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। মাইনে ছাড়াও খুচখাচ লেখার টাকা রুবিকে দিয়ে দেখেছে রঙ্গলাল। সব খরচ হয়ে যায়। নিজের কাছে এ ক'মাস যা রেখেছিল—তাও রুবি চেয়ে চেয়ে নিয়ে যায়—আর ফুরিয়ে দেয়। বললে বলে—বাজারটা কি হয়েছে দেখেছো। সব আগুন।

আগে রঙ্গলাল ঝগড়া করতো। আজকাল আর করে না। এখন যা করে—তার নাম—সাদা বাংলায়—আত্মসমর্পণ। রুবির জটিল জটিল সব হিসেব আছে। সাড়ে সাতশো গুঁড়ো সাবান। তিনশো চা। আড়াইশো হলুদ। যার দাম মুখে মুখে অঙ্ক কষে যোগ দেওয়ার সময় সব গুলিয়ে যাবেই। তাই শেষ পর্যন্ত সে রুবির কাছে সারেণ্ডার করেছে। তার নিজের কোন বাক্স নেই। ড্রয়ার থেকে মলি নোট সরিয়েছে দু'বার।

কুন্তি বলল, সব খরচ করে ফেলেছো? তোমরা পারো বটে। অতগুলো টাকায় আমার দেশে এক বিঘে জায়গা কেনা যায়।

আমি বোনাস তো অনেক টাকা পাই।

কত?

তা পাঁচ-সাত হাজার—। বাড়িয়েই বলল রঙ্গলাল।

ওরে বাবা! তা দিয়ে সাত বিঘে জায়গা হয়ে যাবে। লোকে তোমায় মেয়ে দেবে—

আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে। বয়স হয়ে গেছে কুন্তি।

তাতে কি? শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে তোমার এখনো। দশ বিঘে জায়গা কিনলে তুমি আবার দেশে যে-কারও বউ ভাগিয়ে এনে পালতে পারো। নিজে নিজেই হেঁটে আসবে তারা। জায়গা বলে কথা। বিয়ে হয়েছে তাতে কি! আমার দেশে দু-তিনটে বিয়ে তো লোকে আকছার করে—

কথা বলতে বলতে কুন্তি চা দিয়ে গেল। গ্যাস বন্ধ করে কুন্তি খুশিকে নিয়ে এবারে পাড়া বেড়াতে বেরুলো। রাস্তায় বেরিয়ে কুন্তি এবারে খুশিকে বলবে, মুতু করো বাবু, মুতু করো।

খুশি কুন্তির ভাষা বোঝে। ঠিক বসে যায় ফুটপাথে। কুন্তির এই আদর আর ভাষা নিয়ে তাকে খুব হেনস্থা করে রঙ্গলালের দুই মেয়ে। মলি বলে, কুন্তিদি—তুমি একটি ননিজ্ ডল।

কুন্তি বলবে, ইংরিজিতে খারাপ কথা বোলো না আমায়। আমি সব বুঝি কিন্তু।

রঙ্গলাল ভেবে দেখলো, আমরা বোকার মত খবরের খোঁজে ফিরি। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অভাবে ঘর ভাড়ার কাহিনীতে আমাদের দেশ বোঝাই। একটু খোঁচালেই বেরিয়ে পড়বে। এ কাহিনী ঠিকমত লিখতে পারলেই তো আসল খবর। লোকে কাড়াকাড়ি করে পড়বে। তা নয়—মন্ত্রী নেতা ফিল্মস্টার, শিল্পপতি—কি বলবে—তাই শুনতে, তাই লিখতে আমরা পড়িমরি করে ছোটাছুটি করছি। অথচ খাঁটি খবর তো আমাদের গায়েই বেঁধে আছে।

খুব কদাচিৎ এমন সকাল সকাল বাড়ি ফেরা হয় তার। এক একদিন রুবি বাড়ি থাকে। এক একদিন থাকে না।

কি মনে হতে চারতলায় ফোন করলো রঙ্গলাল। সুদক্ষিণা আছে?

বলছি।

এখুনি চলে এসো। তোমায় দেখতে চাই।

কেন?

এমনি।

বেশিক্ষণ বসতে পারবো না কিন্তু।

এসেই চলে যেও।

দেড় মিনিটের ভেতর হাঁপাতে হাঁপাতে সুদক্ষিণা এসে হাজির। একবার দেখেই রঙ্গলাল বুঝলো এর ভেতরেই মেয়েটি মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়েছে। কাঁধে কালো ব্লাউজের ওপর সাদা পাউডার ছড়িয়ে রয়েছে। খেয়াল করেনি। বৌদি কোথায়?

বেরিয়েছে। এখুনি এসে যাবে, মলির মৃদঙ্গ আনতে গেছে।

মলিটা একদম পড়ে না।

ওর সঙ্গে থেকে থেকে ললিটাও খারাপ হয়ে গেল।

দুজনেই গেছে বৌদির সঙ্গে ?

হ্যাঁ। আমার স্ত্রী যদি ওদের পড়াশুনো একটু দেখতো।

বৌদি দেখবেন কি করে ? মলি তো কথা শোনে না একদম।

মা হয়ে কথা শোনাতে পারে না ? এটা কি রকম কথা সুদক্ষিণা ?

আপনি কথা শোনেন বৌদির ? এক একদিন তো শিব হয়ে ফেরেন।

কদাচিৎ। খুব ক্লান্ত লাগলে বা কারও সঙ্গে দেখা হলো—তবে আমি ড্রিঙ্ক করি। নয়তো ড্রিঙ্কসে আমার কোন আগ্রহ নেই। ক'মাস তো আমি অফিস থেকেই ফিরি রাত একটা দুটোয়।

বৌদিকেও কোন জিনিসে বিশেষ আগ্রহী দেখি না কিন্তু। এখনো এত সুন্দর ফিগার—

এবার তো সুদক্ষিণা নিশ্চয় তুমি ওর স্কিনের কথা বলবে !

তা বলতেই হবে। সামান্য ঘুম দিয়ে উঠে যদি বৌদি সাজেন—তবে তো কথাই নেই।

একদম পরী।

সত্যি তাই। রুবি বৌদির মত সুন্দরী আমি কিন্তু খুব কম দেখেছি। অথচ সাজে কোন উৎসাহ নেই বৌদির।

আমার বেলাতেও কোন উৎসাহ নেই ওর। খোলাখুলি বলবো ?

বলুন না। আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

তোমার বৌদি আজ অব্দি নিজে থেকে আমায় একটাও চুমো খায়নি।

বলেন কি ?

হ্যাঁ। অনেক বন্ধু-পত্নীকে দেখেছি—কথা বলতে বলতে বন্ধুর পিঠে হাত রাখলো। একবার হয়তো ওগো বলে ডাকলো। কিন্তু আমার বেলায় সে সব কিছু ঘটেনি কোনদিন।

কি বলছেন আপনি ? একজনে সব হয় নাকি। এটা তো দুজনের ব্যাপার।

সত্যি। রুবি কোনদিন নিজে থেকে আমায় চুমু খায়নি।

একজনে তো কিস্ করা যায় না। সুব্রতকে তো আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি কোঅপারেট করি। নয়তো কি করে হবে।

রুবি তা বোঝে না।

এমা! কি বোকা! তাহলে তো কিস্ জমেই না।

কিস্ কিস্ বলছো কেন? টেবিলে বালির দানা রেখে তার ওপর কাঁচের প্লেট ঘষলে অমন কিস্ কিস্ আওয়াজ হয়। চুমো বা চুমু বল দক্ষিণা।

না। আমরা কিস্ বলি।

আমরা? তোমরা কারা?

আহা! জানেন না যেন!

রঙ্গলাল আর সুদক্ষিণার ভেতর সাত-আট ফুট মেঝে পড়েছিল। একপাশে চেয়ারে সুদক্ষিণা। উল্টো দিকে সাজানো চৌকিতে রঙ্গলাল। কয়েকখানা চেয়ার, একটি সোফাসেট আর একখানা চৌকি দিয়ে রঙ্গলালের বৈঠকখানা সাজানো।

আমি একটু তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকে দেখবো সুদক্ষিণা—

না। ও কাজটি করবেন না। যেখানে বসে আছেন সেখানেই থাকুন।

তাতে কি। অসুবিধাটা কিসের তোমার? একটু না হয় তোমার মুখের গন্ধও নেব।

ও-সব একদম করবেন না। বৌদিকে যা বলতে পারবেন না—এমন কিছু করবেন না।

সুব্রতকে খুব হিংসে করি আজকাল।

কেন?

এত কো-অপারেটিভ একজনের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেছে।

না সত্যি বলছি—সুব্রত যে কি ভালো—কি বলব আপনাকে। আপনার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে আমার—সব বলেছি ওকে।

আরও অপমানিত লাগলো নিজেকে। সেই অবস্থাতেই মুখটা হাসি-খুশি করে রঙ্গলাল বলল, শুনে কি বললো সুব্রত ?

হাসলো একচোট।

শুধু হাসলো ?

রঙ্গলালের গম্ভীর মুখখানা দেখে কষ্ট হলো সুদক্ষিণার। গম্ভীর হয়ে বানিয়ে বলল, আপনার খুব প্রশংসা করছিল। এত স্ট্রেট লোক আপনি।

শুধু তাই বললো ?

তবে আর কি বলবে ? সুব্রত তো আপনাদের মত অতশত বোঝে না। সিধে ভালো মানুষ।

আমায় হিংসে করে না ?

তা কেন করবে !

আমি তো ওকে করি। ভীষণ করি।

আমার জন্যে তো। এ ভাব আপনার থাকবে না। শিগগির একদিন কেটে যাবে। আপনি প্রচণ্ড খাটেন। এর সঙ্গে একটু সেক্স লাইফ বেশি করে লিড্ করুন—তা হলেই ভালো ঘুম হবে। খিদে পাবে। ফুর্তি পাবেন মনে। সব ভুলে যাবেন।

বিয়ে না করেও তুমি এত সব জানলে কি করে সুদক্ষিণা ?

স্কুলে তো আমার অনেক বান্ধবী। অঙ্ক কষায় চারু, ভূগোলের রেবা—ওরা সবাই ম্যারেড্। ওরা তো সেক্স লাইফের কথা বলে। তাই শুনে শুনে বুঝি।

রঙ্গলাল দেখলো, সুদক্ষিণা পাখার নিচে ছাপার শাড়িটা সামলে নিয়ে বসে আছে। জায়গায়, অন্ধকার জায়গায় আলো। তিরিশ বত্রিশের একটা স্বাধীন মানুষ। স্কুলের মাইনেটা হাত-খরচ। সুব্রত মাঝে মধ্যে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়। কখনো থিয়েটার। কখনো সিনেমা। দু-এক সময় কসমেটিকস্।

তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে ?

এবার হয়ে যাবে। ওদের তো বড় ফ্যামিলি।

সে জন্যে বিয়েয় বসোনি এতদিন ?

না না। তা কেন ? ও এবার একটা ভালো কাজ পাচ্ছে। ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। লিস্টে ওর নাম আছে—ভেতর থেকে জানতে পেরেছে।

তাহলে তোমার ব্যাপারে এবারে আমার কোন চান্স নেই আর সুদক্ষিণা !

আচ্ছা আপনি যে এসব বলেন—আপনি মানে বুঝে বলেন ? যা বলছেন তা বিশ্বাস করেন ?

আমার তো আর কোন ফিউচার নেই সুদক্ষিণা। মোটা হয়ে গেছি। রোজ মোটা হচ্ছি। বয়স হয়ে গেছে।

এমন কিছু বয়স হয়নি। আর বোঝাও যায় না আপনার বয়স।

কি বলছো সুদক্ষিণা ! আর দু-এক বছরের ভেতর আমি মলির বিয়ে দেব।

জামা-কাপড় পরে যখন বেরোন—তখন আপনাকে এখনকার অনেকের চেয়েই কাঁচা লাগে। বয়স বোঝাও যায় না। সে কথা রুবি বৌদির বেলাতেও খাটে। কে বলবে মলির মত মেয়ে আছে আপনাদের !

তাহলে তুমি আমায় পাত্তা দাও না কেন ?

আমার কথা ছেড়ে দিন। ভালো কথা—আমার বান্ধবী বিজলী আপনাকে দেখেছে। সে মলিকে চেনে। মলিকে বলেছে—তোর বাবাকে আমি এখনো বিয়ে করতে রাজী। মলি তো ক্ষেপে লাল।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও তো।

তা দেব। ওর জন্যে একজন ভালো পাত্র দেখে দিন না।

আমি কি ঘটক নাকি।

না। অনেকে আসেন তো আপনার কাছে—

৬

প্রভাতে ফিচার লেখাবার ভালো লোক নেই। প্রায় রাস্তা থেকে ধরে আনা লোক দিয়ে আজ ছ' মাস হলো রঙ্গলাল ফিচার লেখাচ্ছে। কেউ উঠতি কবি। কেউ বা প্রেমিকা সমেত এম. এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে—আর রঙ্গলালের দেওয়া লাইন ধরে নানা সাব্জেক্টে লেখা দিচ্ছে। জীবনের এই জায়গাটায় এসে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে—যাকে বোঝা সবচেয়ে কঠিন—তার নাম মানুষ। বিশেষ করে যারা বয়সে ছোট—তাদের বুঝে ওঠাই কঠিন। এরা ভালোবাসলেও বোঝে না।

এর চেয়ে বরং সে তার বড়দের বুঝতে পারে। এমন কি দৈনিক প্রভাতের এম. ডি-কেও বুঝতে পারে। কথায় কথায় তিনি অতীতে চলে যান। একদিন বলছিলেন ভালো। রঙ্গলালকে বলেছিলেন—জানো রঙ্গলাল—বালক বয়সে আমি সরলা দেবীর নাচের দলে ঘুঙুর পায়ে সখী সাজতাম। সরলা দেবী চৌধুরাণী। নাম শুনেছো?

আজ্ঞে শুনেছি।

এক একদিন মনে আনন্দ হলে টেবিলে তাল দিয়ে টপ্পা গেয়ে ওঠেন। এ-সব গান আজকাল আর কেউ গায় না। লোকে ভুলে গেছে। সুন্দর সুর। সুন্দর কথা। সব সময় ফুর্তিতে আছেন এম. ডি.। সুরুচিস্নিগ্ধ হাসি-মাখানো মুখখানি। রঙ্গলালের এক এক সময় মনে হয়—কোন ডকুমেণ্টারি ফিল্মে ওঁকে ধরে রাখা দরকার। নয় তো পরে—যারা ওঁকে দেখেনি—তারা শুনেও বুঝতে পারবে না কি জিনিস। রবীন্দ্রনাথ, বালা সরস্বতী, ইনার আই, সিকিম করার পর সত্যজিৎ যদি ওঁকে নিয়ে ডকুমেণ্টারি করতেন—তাহলে এক আশ্চর্য জিনিস হতো।

কত কাজ যে বাকি!

এক এক সময় মনে হয় রঙ্গলালের—জীবন থেকে জগৎ থেকে সুন্দর জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। বড় জিনিস ভুলে যাচ্ছে মানুষ। চিঁড়ে গুড় বেঁধে নিয়ে একজন সাধারণ বাঙালী সাংবাদিক সিপাহী বিদ্রোহের পরেকার বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গাঁয়ে গাঁয়ে। কি না—সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের খবর যোগাড় করবেন। সেদিন তো সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিয়ে বলার কেউ ছিলো না।

নবীন কবি পার্থ, সবে গল্প লিখছে একরাম আর সিনেমার কথা লিখিয়ে নতুন পাতলা মত সোমকল্যাণ—তিনজন—২৬।২৭ থেকে ৩২-এর ভেতর বয়স হবে। রঙ্গলালের সঙ্গে ভেবে ভেবে কথা বলছিল। তিনজনই পরে একদিন ভালো লিখবে। এখনো লিটিল ম্যাগাজিনের গন্ধযায়নি। ওরা রাম খাচ্ছিল—একটু তাড়াতাড়ি। টেবিলে রঙ্গলালের জন্যে অন দি রক হুইস্কি। পেগ পিছু তিন টুকরো বরফ। প্রেস ক্লাবের লনে সন্ধ্যে রাতের আলো। রঙ্গলালের অসুবিধা অনেক।

এগিয়ে গিয়ে ভালোবাসলে ভুল বুঝবে তিন যুবক। সত্যি সত্যি কড়া সত্যি বলে দিলে ওদের ভীষণ বিঁধবে। পৃথিবীর এখনো অনেক কিছুই জানা বাকি। রঙ্গলাল লক্ষ্য করেছে—উঠতি নবীন মানুষ দেখলে তার ভেতরকার স্নেহ সবচেয়ে আগে কাজ করে। কিন্তু তার স্নেহ যদি বেরিয়ে পরে—তাহলে নবীন মানুষের ভেতরকার অহমিকায় আঘাত লাগতে পারে। তাই সাবধানে মিশছিল রঙ্গলাল। খানিকটা ঘনিষ্ঠ। খানিকটা দূরে দূরে।

কবি, গল্পকার, প্রেমিক, প্রাবন্ধিক, অনুসন্ধানী মানুষজন নিয়েই তো খবরের কাগজ। একটা লেখা খারাপ হবে। দুটো খারাপ হবে। তিনটে। তারপর চার নম্বর লেখা ঠিক জমে যাবে। সে পর্যন্ত সহানুভূতি নিয়ে রঙ্গলালকে ধৈর্য ধরতে হবে।

ওদের সঙ্গে কথা বলছিল—আর অন্য কথা ভাবছিল রঙ্গলাল। কলকাতার ভাড়া বাড়ি, জমির দাম, বাড়ি তৈরির খরচ, সাধারণ চাকুরিজীবীর জমানোর সামর্থ্য, সরকারী ফ্ল্যাটের ভাড়া, অ্যাপেক্স

কো-অপারেটিভ, বে-সরকারীভাবে বিক্রির ফ্ল্যাট—এ সব মিলিয়ে কালকের টাউন এডিশনের দৈনিক প্রভাতের পয়লা পাতায় বড় স্টোরি থাকছে।

রঙ্গলাল জোর দিয়েছে একটি ব্যাপারে। সরকার শহরের বড় জায়গা হাতে নিয়ে মাল্টিস্টোরিড্ বাড়ি তুলুন। সাধারণ চাকুরের বেতন থেকে মাসে মাসে কেটে নিয়ে সে টাকা শোধ করা হোক। হেডিংটা ভেবেছে এ রকম—

সাধারণের জন্য সাধারণ বাড়ি ধাপধাড়ায় কে যাবে?

সঙ্গে কলকাতার ম্যাপে অন্তত তিরিশটি খালি জমির জায়গা পিনপয়েন্ট করা হয়েছে। তিন কলম ষাট পয়েন্ট হেডিং। তার নিচে আটচল্লিশ পয়েন্ট। সাইড স্টোরি থাকছে—একজন সাধারণ চাকুরের টাকা জমানোর সামর্থ্যের ওপর। উপরন্তু সংবিধানের ডিরেক্টিভস থেকে বাসস্থানের জায়গার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতির খানিকটা ব্লকের মত ছেপে দেওয়া হবে নিচের দিকে।

এর পর এখন যে-যেমন বোঝে।

পার্থ বলল, আপনি এডিটোরিয়াল পেজে কবিতার ওপর খানিকটা জায়গা দিন।

সে তো গ্রন্থ-সমালোচনায় বেরিয়েই থাকে।

একরাম জানালো, না, আলাদা করে নতুন কবিদের কথা, গল্পের আলোচনা থাকলে ভালো হয়।

নতুন কবি-গল্পকারদের কথা রিডার তো জানে না। তার কাছে এরা সবাই ফরেন। তবু দেওয়া যায়। যদি লেখাটা ভালো হয়। এখন লিখবেটা কে? লেখার মত লেখা চাই, তাহলেই সব মানিয়ে যায়।

আমি লিখবো। সোমকল্যাণ নিজেকে সংশোধন করে বলল, আমরা লিখবো।

রঙ্গলাল তিনজনেরই মুখের দিকে তাকালো। এখনো অনিশ্চিত

গন্থ। তবে এটাও ঠিক—গুঁতো খেয়ে খেয়ে একদিন ঠিকই ভালো লিখবে। এদেরই একজনের একটা বড় লেখা বেরিয়েছিল। বয়সের দর্পে মিথ্যে ব্রাভাডোর লোভে বাইরে গিয়ে গল্প করেছে—রঙ্গবাবুর ওখানে লিখি—কারণ, একশোটা টাকা পাওয়া যায়। নইলে ওখানে কে যায়!

রঙ্গলাল আরও চার পেগের অর্ডার দিয়ে নিজের মনেই ভাবলো—হয়তো কালই গোলদীঘির পাড়ে বসে বন্ধুদের ভেতর এদেরই কেউ বলবে—কাল সন্ধ্যেবেলা রঙ্গ হাবাটাকে যা যক্ দেওয়া গেলো না! উঃ!

রঙ্গলাল বলল, আবার বৃষ্টি আসছে। চল ভেতরে গিয়ে বসি সবাই।

তিনখানা টিকিট সিল-আপ করে মোট ন' টাকা মানি-অর্ডার করতে হবে লুধিয়ানায়। তাহলে একখানা স্টেনলেস স্টিলের গামলা ভি. পি আসবে। সেটা ছ' টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেও—টোটাল দাম পড়লো. জিনিসটার পনের টাকা। আর বাজার থেকে নগদ একত্রিশ টাকার নিচে পড়বে না।

রুবি তাই দু' মেয়ের নামে একখানা করে ফর্ম সিল-আপ করলো। বাকি ফর্মখানায় নাম লিখলো—শ্রীমতী খুশি সেন। খুশির নামেও এবার লুধিয়ানা থেকে টিকিট আসবে। খুশি যে আসলে একটি কুকুর—অত দূর থেকে কে তা দেখতে আসছে!

কালীঘাট গণেশ কাটারার উল্টো দিকে মায়ের বাড়ি যাবার রাস্তায় অনেক দিন পরে রুবি এনামেলের একজন ভালো বাসনওয়ালা পেয়েছে। দাম খুব ন্যায্য। জিনিসও ভালো। ওজনে ঠকাবে না কিছুতেই। দরকারে পাল্টেও দেয় তাকে। তিনটে ডেকচি কেনা দরকার। একটা সসপ্যান। কাপড়ের মাড় দেবার জন্যে ছোটটা তো প্রায়ই আটকে থাকে। এছাড়া কিছু দুধের বাসন চাই। খুশির জন্যে নতুন করে কলাইয়ের একখানা বগি থালাও কিনতে হবে। ওকে খেতে দিলে ছড়িয়ে ছাড়া খেতে পারে না।

মলি ললি স্কুলে। কুন্তি গেছে পাড়া বেড়াতে। ও এখন অফিসে। এই বৃষ্টি আসে। এই চলে যায়। আবার রোদ্দুর।

শাড়িটা পাল্টে রুবি বেরিয়ে পড়ল। লুধিয়ানা বক্স নম্বর ৩১৩-র ঠিকানায় টাকা আর ফর্ম পাঠাতে হবে। তাছাড়া অমৃতসরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে সতেরো টাকা। সেখান থেকে আসবে একখানা সিল্কের শাড়ি আর পাঁচখানা ফর্ম। সেগুলো ফিল-আপ করে পাঁচখানা ফর্মের টাকা পাঠাতে পারলে আবার শাড়ি দু'খানা।

রুবি ফাউন্টেন পেন নিয়ে রাসবিহারীর ডাকঘরে গেল। স্ট্যাম্প পোস্টকার্ডের কেরানী মেয়েটি থেকে শুরু করে পোস্টমাস্টার—সবাই তাকে চেনে। গেলে ভেতরে নিয়ে বসায়। ওঁরা বলেন, কাগজে আমাদের কথা একটু লিখতে বলুন আপনার কর্তাকে।

ডাকঘর থেকে বেরিয়ে রুবি হাঁটতে হাঁটতে এনামেলের বাসনের দোকানে এল। তারা খাতির করে বসিয়ে নানা সাইজের কেটলি দেখাচ্ছিল।

রুবি বলল, থাক। কেটলি আরেকদিন নেব। ওই ডেকচিটা ওজন করুন তো।

ওজন হলো। দামদস্তুর হলো। তারপর রুবি বলল, আলাদা করে রেখে দিন। দু-তিনদিনের ভেতর এসে নিয়ে যাবো।

এই সাইজের ডেকচি অমোদের স্টকে আরও আছে মা। আলাদা করে রাখার দরকার নেই। একদিন অন্তর একদিন বড়বাজার থেকে মাল আসে।

রুবি দোকান থেকে বেরিয়ে একটা ভীষণ আনন্দে ভিড়ের ভেতর মিশে গেল। দোকানে দোকানে সায়া, ব্লাউজ, রিডাকসনের শাড়ি ঝোলানো। দোকানে দোকানে বাসন। দোকানে দোকানে শাড়ি। মনোহারি দোকানগুলো নানারকম সাবানে বোঝাই। এমন কি মুদির দোকান-গুলোর তাক বাদাম তেল, ডালডার ঝকঝকে টিনে আলো হয়ে আছে। হরলিক্স, আমূল, মশল্লার প্যাকেট—সব কিছুতেই নিওনের আলো পড়ে

ঠিকরে পড়ে সন্ধ্যেবেলা। সাংসারিক টুকিটাকি চারদিকে সাজানো। আটপৌড়ে শাড়ি, তাড়াতাড়িতে রান্নার মশল্লা, দই পাতার দুধ, কাপড় ফর্সা করার ঢালাও আয়োজন। কার মন না এসব দেখে তৃপ্তিতে ভরে যায়? না কিনলেও—দেখেও তো সুখ।

সামনেই শ্রাবণ পূর্ণিমা। তারকেশ্বরের মানত নিয়ে বাঁক কাঁধে বোম্ ভোলের দল চলেছে। এই বৃষ্টি। এই রোদ্দুর। আবার বৃষ্টি। রুবি গিয়ে একটা দোকানের সাইনবোর্ডের নিচে দাঁড়ালো। সামনেই রাস্তার ওপারে একটা ছ'তলা বাড়ির গায়ে চিট ফাণ্ডের ঢাউস বিজ্ঞাপন। এ জিনিসটা রুবি জানে না। রঙ্গলালকে বলতে হবে।

রঙ্গলালকে বলে আর কি লাভ! পুরুষমানুষের যদি কোন দিশে থাকে। চলেছে তো চলেছে—তালকানার মতো। আমি তো ওকে ছেড়ে দিয়ে দেখলাম। কতদূর যায় দেখি। একটা কথাও বলিনি। নিজের কাছে সংসার খরচের টাকা রেখে মজা বোঝো। কত ধানে কত চাল। ইস্ত্রির পয়সা। পাঁচশো সর্ষের তেল। পঞ্চাশ সর্ষে। যা দরকার—ঘন ঘন পয়সা চেয়েছি। কুন্তির হাতে বাজারের থলে দিয়ে রঙ্গলালের কাছে পয়সার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি। হিসেব চাইলে খুচরোর অঙ্ক বলে গেছি অনর্গল। মনে মনে যোগ দিয়ে যা মেলাতে পারবে না।

শেষে তিতোবিরক্ত হয়ে সব টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছে। কোন পুরুষ মানুষকে—বিশেষত নিজের কর্তাকে কখনো লাই দিতে নেই। দিয়েছো কি মাথায় উঠবে। তাই সবচেয়ে আগে এটা ঠিক করতে হবে—ওর মাস মাইনে কার কাছে থাকবে? আমার কাছে? না, ওর কাছে? ও মাইনে পেয়ে এসে টাকাটা আমার হাতে দিলে তবে বুঝি—আমি ওর বউ। নইলে তো নিজেকে বউ বলে মনেই হয় না।

পরম পরিতৃপ্তিতে রুবি একটা মনোহারি দোকানে ঢুকে পড়লো। রাস্তা থেকেই সে আশি নম্বর সুতোর গুলির প্যাকেট দেখতে পেয়েছে। সুতো না কিনুক রুবি—তবু একবার হাত বুলিয়ে দেখবে। বছর দশেক জিনিসটা বাজার থেকে উধাও।

ঠিক এই সময় রুবির বাড়িতে তার দুই মেয়ে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে দিল। মাথা অব্দি চাদর টেনে দিয়ে দুজনেই শুয়ে পড়লো। তারা তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরেছে। এখন তাদের হাফ-ইয়ার্লির দুখানা প্রোগ্রেস রিপোর্ট তাদেরই মাথার বালিশের নিচে। ললির ক্লাসসুদ্ধ মেয়েরা প্রায় সবাই ফেল। তার ভেতর ললি কোনক্রমে পাস করে থার্ড। তা ফেল করারই সামিল। মলি কোন সাবজেক্টে পাস করতে পারেনি। হেড-মিস্ট্রেস গার্জিয়ানকে দেখা করতে বলেছেন।

অন্য দিন ওরা স্কুল থেকে ফিরলে খুশি দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের ওয়েলকাম করে। আজ কোন পাত্তা না পেয়ে খুশি ওদের পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো। তারপর গোটানো মশারিটা দাঁতে কাটতে লাগলো।

বিকেল নাগাদ তিন প্যাকেট পোকা মারার ওষুধ কিনে রুবি বাড়ি ঢুকলো। খুশি কোথায়? বড় রাস্তায় বেরিয়ে যায় নি তো? মেয়েদের ঘরখানা বন্ধ দেখে রুবি এক ধাক্কায় কবাট খুলে ফেললো। ইস্। ঘর যে খুশির গায়ের বোটকা গন্ধে ভরে গেছে। তোরা শুয়ে কেন? ওঠ্। এই অবেলায় শুয়েছিস কেন?

রুবিকে দেখে খুশি খাট থেকে নেমে গেল। ললি উঠে বসলো। দিদি সব সাবজেক্টে ফেল করেছে। বড়দিমণি বাবাকে স্কুলে যেতে বলেছে—

সব সাবজেক্ট? তা মাস্টার মশাই তাহলে কি পড়ান?

দিদি না পড়লে মাস্টার মশাইয়ের দোষ কি?

মলি উঠে বসলো। এক চড় কষাবো। বড়দের রেজাল্ট নিয়ে কথা কেন?

বিছানায় বসেই রুবির প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তাহলে তোদের বাবা এসে তো কেলেংকারি করবে।

আমার গায়ে হাত দিলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবো।

পালিয়ে কোথায় যাবি?

পথে পথে ঘুরবো। তারপর অনেক দিন পর বড় হয়ে ফিরে আসবো। বাবা অবাক হয়ে যাবে—

ও সব গল্পে হয় মলি। সারা বছর একটু একটু করে পড়লে পারিস।

দিদি পড়বে কি করে মা? সারা খাতা জুড়ে চিঠি লিখে রেখেছে—

কাকে? রুবি চমকে উঠলো প্রায়।

ললি কি বলতে যাচ্ছিল। মলি বলল, মারবো এক চড়। গুরুজনদের নিয়ে কে তোকে কথা বলতে বলেছে?

ললি তবু বলে দিল, অংকের খাতা ভরে তুই ধর্মেন্দ্রকে তিনখানা চিঠি লিখিসনি দিদি? প্রিয় ধর্মেন্দ্রদা—

বেশ করেছি লিখেছি।

ভূগোলের ম্যাপখাতায় তুই অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, হেমা মালিনী, রেখার মুখ ট্রেস করিসনি?

বেশ করেছি।

জানো মা—দিদি লিখেছে—অমিতাভদা। আই লাভ য়ু। বাবা দেখলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

দেয় যেন। আমারও হাত চলবে।

রুবি বলল, ডাল ভাত খেয়ে ধর্মের ষাঁড় হয়েছে। এত বড় মেয়ে—সংসারের একটা কাজ করো না। শুধু কুকুর নিয়ে লাফালাফি। জগৎ ডাক্তারের কাছ ছোটাছুটি! আজ ও যত রাতেই ফিরুক—তোমাদের সব কথা আমি বলে দেব।

সত্যি দিদি তুই পড়িস না কেন?

থাক। আর উচিত বক্তা হতে হবে না।

পৃথিবীতে একই সঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেগুলো কোন স্টেজে এক জায়গায় ঘটছে না বলেই আমরা দেখতে পাই না। একসঙ্গে তিন কোটি ঘাস বড় হচ্ছে। সাতাশি লক্ষ ঢেউ এইমাত্র ভেঙে গেল। যে সন্ধ্যা আর কোনদিন ফিরবে না—তার ভেতর দিয়ে একটি পাখি বাসায় ফিরলো।

রবীন্দ্র সদনে সুচিত্রা মিত্র শুনে প্ল্যানেটোরিয়ামের গা দিয়ে অফিসে ফিরছিল রঙ্গলাল। মণি ব্রেক কষলো।

সুদক্ষিণাদি—

কোথায়?

ওই তো।

সুদক্ষিণা বেগুনি রঙের ছাপা শাড়ি ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। বাস পাচ্ছি না। আপনি কোন দিকে?

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো রঙ্গলাল, এসো না।

আমি কিন্তু বাড়ি ফিরবো এখন।

বেশ তো। বলতে বলতে রঙ্গলালের মনে হলো, ঠোঁটেও বেগুনি রঙের স্টিক বুলিয়েছে। এখানে কোথায় এসেছিলে?

ও আসবে বলেছিল!

আসেনি?

বাস-ট্রামের তো কোন ঠিক নেই। কেন যে এলো না! চুপ করে থেকে সুদক্ষিণা বলল, সুব্রতর জন্যে একটা কাজ দেখে দিতে পারেন?

কেন? সে চাকরিটা হয়নি?

কোন চিঠি আসেনি। কোথায় চললেন? না না, আমি এখন বাড়ি ফিরবো।

নিশ্চয়ই ফিরবে। তুজনে বসে একটু চা খাবো। তারপর তোমাকে নামিয়ে দিয়ে এলে এ-গাড়িতেই আমি অফিসে ফিরবো।

বেশিক্ষণ কিন্তু দেরি করবো না।

মোটেই না।

কাছাকাছির ভেতর তিব্বতীদের 'কুঙ্গা' রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। বেশ পরিষ্কার কিউবিকিল। জিউক বক্সে বাজনা বাজছিল। মৃত্থ সুরে।

কুঙ্গায় ঢুকেই সুদক্ষিণার টেনশন যেন খানিকটা কমে গেল।

রঙ্গলাল কিছু খাওয়ার কথা বলতেই সুদক্ষিণা রাজী হয়ে গেল। হাল্কা কিছু বলুন। আমি আবার ডায়েটিং করছি।

খাবারের সঙ্গে ছুটো জিনের কথাও বলে দিল। সে নিজে বড় একটা খায় না। সুচিত্রা মিত্রের গান তার মাথার ভেতর গলগল করে ঢুকে গিয়ে মোচড় দিচ্ছিল। একদম গরম তরল ধাতু। তারপর এই সুদক্ষিণা।

জিন আসতেই সুদক্ষিণা গোড়ায় বলল, না না। এসব আমি খাবো না। ও শুনলে দুঃখ পাবে।

আমিও খাই না। তোমার অনারে সুদক্ষিণা। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমায়—

এক সিপ মুখে দিয়ে সুদক্ষিণার ভেতর থেকে হাসি চলকে উঠলো। কি খাবারের অর্ডার দিলেন?

সিজেলড্ চিকেন।

সেটা কি জিনিস?

ছাখোই না কেমন। ধোঁয়া ওড়ানো মুরগির মাংস—মাখো-মাখো করে ভাজা। ও শুনলে দুঃখ পাবে না তো?

সুব্রতকে আপনি খুব হিংসে করেন!

করিই তো। বিনা চেষ্টায় তোমার মতো একজনকে—

চেষ্টা করে পেয়েছে আমাকে। অনেক কষ্ট করেছে। এখনও যদি একটা ভালো কাজ পেতো। এক সিপে লাইম কর্ডিয়াল মেশানো সবটা গলায় ঢেলে দিয়ে সুদক্ষিণা বলল, আরেকটা বলুন তো। বেশ তো খেতে।

আরো দুটোর অর্ডার দিয়ে রঙ্গলাল বলল, আস্তে আস্তে খাও। নয়তো নেশা হয়ে যাবে।

কিচ্ছু হবে না আমার তো এখন বয়সের তেজ। ভালো কথা। আমায় একটা চাকরি করে দিন না।

কেন? দৈনিক প্রভাতে সুদক্ষিণার কলম তো এখন বেশ পপুলার। টাকাও তো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওর ইচ্ছে না আমি বাইরে কাজ করি।

এমন ফিউডাল কেন সুব্রত ? ও কি তোমার মালিক ?

এবারের পেগটাও এক ঝাঁকুনিতে শেষ করে দিল সুদক্ষিণা। বেয়ারা ধোঁয়া ওড়ানো বাছাই মুরগির মাংস পাথরের প্লেটে এনে হাজির করলো। রঙ্গলাল মোটা চামচে সে মাংস চেপে ধরতেই সিজ্ সিজ্ আওয়াজ হলো।

সুদক্ষিণা বললো, এই শব্দের জন্যেই কি 'সিজিলিং' নাম হয়েছে ?

হতে পারে। আমার ভিতরকার কোন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো তুমি ?

সব শুনতে পাই। কিন্তু আপনি কোনদিন কিছু করতে পারবেন না। শুধু মুখেই বলে যেতে পারবেন।

আমার যে বয়স হয়ে গেল।

বাজে বকবেন না তো। দিন এদিকে। রঙ্গলালের হাত থেকে প্লেট নিয়ে তুজনের জন্যে তু প্লেটে ভাগ করে দিতে লাগলো। ভাগ করে দিয়ে বললো, আমার পাশে এসে বসুন না। এখানে হাওয়া বেশি পাবেন।

রঙ্গলাল পাশে বসে সুবোধ বালকের মতোই সিপ করছিল গ্লাসে। তার ভেতর তু-এক টুকরো মুখেও দিল।

সুদক্ষিণা আরেকটা পেগ বলতেই রঙ্গলাল ওর মুখে তাকালো। তুটো ফরসা কান লাল হয়ে উঠেছে। দিনের নেশা বিশ্রী জিনিস। সুদক্ষিণার বাড়ি ফিরতে হবে। তার যেতে হবে অফিসে। নাইট এডিটরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে রঙ্গলালের ছুটি। তার আগে নয়।

আর নয়। তোমার তো ফিরতে হবে।

সে আমি বুঝবো।

না সুদক্ষিণা। চলো আমরা উঠি। বলে সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়ালো রঙ্গলাল। তার পেছন পেছন সুদক্ষিণাও দাঁড়ালো। সামনে পর্দা ফেলা। তুখানা চেয়ারের ফাঁকে তুজন দাঁড়ালো। পাশাপাশি। সুদক্ষিণা পেছন থেকে রঙ্গলালের মুখের দিকে মুখখানা তুলে ধরলো। প্রায় একটা বড় ফুলের মতোই নিজের তুখানা হাতের অঞ্জলিতে সুদক্ষিণার ভাপানো

মুখখানা আরেকটু তুলে ধরলো রঙ্গলাল। এই সময়ে চোখ বোজার নিয়ম। সুদক্ষিণা তা ভুলে গেল। জিন জিনিসটাই খারাপ। রঙ্গলাল তার ভারি মাথাটা নামিয়ে এনে সেই মুখে রাখতে গেল। আর অমনি রক্ত মাংস হাড় দিয়ে তৈরি তার ভারি ঘাড়ের ভেতর খচ্ করে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে সে মুখখানা তুলে নিল। হয়তো ঘুরে পড়ে যেত ব্যথায়। কাঠের পার্টিশানটা হাত দিয়ে ধরে ফেললো রঙ্গলাল।

কি হলো? বলে নিজের মুখখানা স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো মানুষের মুখ করে ফেললো সুদক্ষিণা।

ঘাড়ে লাগলো।

আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। সরুন।

বিলটা দিয়ে একসঙ্গে বেরোবো।

না। সরুন। আমি একটা মিনি ধরে নেব এখান থেকে।

মণিই তো পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমাকে।

সুদক্ষিণা কোনো কথা না বলে প্রায় জোর করেই বেরিয়ে গেল।

দিদি, তোকে বিশ্বনাথদা ডাকছে।

বল্ গিয়ে আমার আর সিনেমার টিকিট লাগবে না। আমায় এবার পড়াশুনো করতেই হবে—

অমর-আকবর-অ্যান্টনির ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোর টিকিট এনেছে তোর জন্যে। ভিড়ের ভেতর লাইন দিয়ে।

বলে দে ঠিক যা দাম টিকিটের তাই দেব।

বিশ্বনাথদা তো একটা পয়সাও ব্ল্যাকে চায়নি তোর কাছে। আমায় তো বললো, মলির কথা আলাদা। কাল ছবির রিলিজ। তোর চিন্টুদা, অমিতাভদা আছে।

তবে ডাক্। কিন্তু বাবা তো বিকেলে এসে পড়বে না—কি বলিস?

এখন তো সন্ধ্যে। বাবা এখন ফিরবে না।

মলি দরজায় গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়ালো। কি রে বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ উল্টো দিকের বাড়ির রকে আড্ডা দিচ্ছিল। বছর একুশ বয়স হবে হয়তো। মুকেশের গান গলায় খুব ভালো তোলে। ওর বাবার মুড়কির দোকান বাজারে। ছেলেকে তিনি দোকানে বসান ক'দিন। ক্যাশ ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি নিজেই আবার বসছেন। মলির বাবাকে তিনি সব একদিন বলছিলেন বৈঠকখানায় বসে। আর একদিন ওর বাবা এসে মলির বাবাকে বলেছিলেন, পাটনার কোনো হোটেলে মাসকাবারি কড়ারে গাইতে গেছে মশাই—কিন্তু কোনো চিঠি দিচ্ছে না কেন বলুন তো?

প্রায়ই এখানে সেখানে গাইতে যায় মাঝে মাঝে। এসে মলিকে, সুদক্ষিণাদিকে সেসব গল্প বলে।

বিশ্বনাথ এগিয়ে এসে সাদা মতো একখানা ভাঁজ করা কাগজ দিল।

অমর-আকবরের টিকিট?

বাড়ি গিয়ে খুলে ছাখ না।

তুজনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সুদক্ষিণা আর সুব্রতকে।

রুবিকে রঙ্গলাল বলেছিল, অনেকদিন কোন প্রেমিক-প্রেমিকা দেখিনি। একদম কাছে থেকে। সময়ই পাই না কারও সঙ্গে মেশামিশির।

বেনারসী ল্যাংড়া, ভাপানো ইলিশ, কাচ মুর্গী—আর খেতে বসার আগে সামান্য হুইস্কি। শুধু বরফ-কুঁচি দিয়ে।

ইলিশ মাছ ভাজা—তার সঙ্গে আধগ্লাস মতো হুইস্কি। মলি জোয়ান বেইজের রেকর্ড চাপিয়ে দিল প্লেয়ারে। ঘণ্টাখানেকের ভেতর সুদক্ষিণা সুব্রতর বুকে টোকা দিয়ে বলল, ছাখো তো মলির বাবা আমার সঙ্গে কেমন নাচছেন। তুমি আর রুবি বৌদি সেই থেকে বসে আছো। এসো। সবাই মিলে নাচি। রঙ্গলালের হাতে তখন তার একখানা হাত।

মলি বলল, সুদক্ষিণাদি, কুংফু ডান্স দেখবে ? উ-উ-আঃ।

রুবি বলল, রাখ তোর কুংফু। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, গরম গরম খেয়ে নেবে সবাই।

সবার আগে উঠে দাঁড়ালো সুব্রত। তাকে সবচেয়ে ভালো লাগছিল রুবির। কোন চাল নেই। খাওয়ার শেষে সুব্রত আরেকটা আম চাইতেই রুবির মনটা সুব্রতর জন্যে এক রকমের স্নেহে ভরে গেল।

বেলা দশটা নাগাদ মলি প্রায় প্রকাশ্য রাজপথে বিশ্বনাথকে পাকড়াও করলো। এই শোন। সেদিন সন্ধ্যে সন্ধ্যে অন্ধকারে আমায় কিসের টিকিট দিলে ?

বিশ্বনাথ সট্‌কে যাচ্ছিল।

এই দাঁড়া। প্রেমপত্র দিলি কেন আমায় ?

তুই একটু ভেবে ছাখ না মলি।

ভাবাভাবির কিছু নেই।

ভেবে-টেবে একটা জবাব দে—

বড় রাস্তায় পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হচ্ছে।

তাই ট্রাফিকের প্রায় সবটাই এ রাস্তায়। ছুখানা লরি মুখোমুখি এসে ওদের ছুজনকে আলাদা করে দিল।

রাত একটা নাগাদ অফিস থেকে ফিরে খেয়ে উঠতে উঠতে রঙ্গলালের প্রায় ছুটো হয়ে গেল। তখন পান মুখে সিগারেট ধরিয়ে রুবিকে বলল, তুমি জেগে আছো কেন ? শুয়ে পড়। প্রেসে একটা ফোন করতে হবে।

এখন আর ফোনের দরকার নেই।

বাঃ ! পয়লা পাতায় সব নিউজ বসলো কিনা জানবো না ?

নিজের বাড়ির দিকে একটু তাকাও।

কেন ! তোমার কোন ভি. পি. ছাড়ানো বাকি আছে নাকি ?

ঠাট্টা রাখো। আমি ছাড়াও এ-বাড়িতে তোমার ছুটো মেয়ে আছে।

রঙ্গলাল সুর করে বলল, খুশি নামে একটি অবাধ্য কুকুর আছে।

সব ক'টা চেয়ারের পা কামড়ে শেষ করে দিয়েছে। তাছাড়া কুন্তি নামে একজন পাড়াবেড়ানী কাজের মেয়েলোক আছে—যার আসল নাম হওয়া উচিত ছিল—গেজেট।

তোমার বড় মেয়ের কথা বলছি।

কেন মলির কি হয়েছে? রঙ্গলাল ঘুরে বসলো।

হাফইয়ার্লিতে ফেল।

জানাওনি কেন আমাকে?

তোমায় পেলাম কখন যে জানাবো? ও হপ্তায় রেজাল্ট বেরিয়েছে। সব সাবজেক্টে ফেল।

সব সাবজেক্টে? মাস্টারমশাই তিন বছর ধরে পড়িয়েও ওকে পাল্টাতে পারলেন না। কোথায় মেয়েটা? বলে রঙ্গলালের খেয়ালই থাকলো না—প্রেসে এখন তার একবার ফোন করার দরকার ছিল।

চেঁচিয়ে কি হবে? দু'বোন ঘুমুচ্ছে এখন।

তবু রঙ্গলাল ওদের ঘরে গেল। আলো জ্বালতেই চোখে পড়লো, দুই মেয়ের মাঝখানে খুশি প্রায় মানুষের মতোই বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। গায়ে মলির একটা অল্প বয়সের ফ্রক। কোমর অব্দি মলির সঙ্গে একই চাদর শেয়ার করেছে। বোটকা গন্ধ দুই মেয়ে ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস দিয়ে টানছে। এখনো খুশি মাঝে মাঝে নিজের গু খেয়ে ফেলে।

ঘুমন্ত অবস্থায় হ্যাঁচকা টানে তুলে দেবার ইচ্ছে হলো রঙ্গলালের। তারপর ভাবলো মলির গালে পাঁচ আঙুলের এক চড় কষিয়ে দেয়।

রাত দুটো। রঙ্গলাল ওদের পড়ার টেবিলে বসলো।

ব্যাকরণ কৌমুদির ঘিয়েভাজা চেহারা। অ্যালজেব্রার সাতাশ থেকে একত্রিশ প্রশ্নমালা উধাও। কোন খাতার মলাট নেই। বছরের গোড়ায় গোড়ায় কিছু ডাইরি, ক্যালেণ্ডার পায় রঙ্গলাল। দু'বোন তার কয়েকখানা নেবেই। নিজেরা ক্লাসওয়ার্ক লিখবে বলে নেয়। আর নেয় দিদিমণিদের জন্যে।

তারই একখানা খুলতে একটা পাতা বেরিয়ে পড়ল। রঙ্গলাল মলির লেখা মন দিয়ে পড়তে লাগলো।

এনিবডি নেভার উইল সি মাই ডাইরি। অগর কোই দেখেঙ্গে তো হামারে হাতসে উও নিকাল নেহী সকেঙ্গে।

এক জায়গায় স্কুলের নামের পাশে রঙ্গলালের গাড়ি ও ফোনের নম্বর।

টু ডে আই ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট টেন থার্টি। অ্যাণ্ড দেন আই ডিড মাই প্রেয়ার টু গড। অ্যাণ্ড ওয়েন্ট টু ক্লাস। গো টু দি ক্লাস। আই রিড ফার্স্ট পিরিয়ড টু লাস্ট পিরিয়ড। অ্যাণ্ড দেন টক্‌ড এ ফিউ মিনিটস্ উইথ মাই ওয়ান টিচার। সি ইজ দি টিচার অব মাই স্কুল। আই টোল্ড হার সাম প্রবলেম।

দেন আই কট বাস নাম্বার ওয়ান। অ্যাণ্ড রিচ্‌ড রাসবিহারী অ্যাট ফাইভ ও'ক্লক। দেন আই কট ৩২ নম্বর ট্রাম। অ্যাণ্ড রিচড মুদিয়ালী অ্যাট পাঁচটা দশ। অ্যাণ্ড কেম ব্যাক টু হোম অ্যাট পাঁচটা পনের। মাদার গেভ মি রাইস। আই এট্ অ্যাণ্ড স্পেণ্ট ফর ফিউ মিনিটস্। আই ওয়েন্ট ফর দোতলা অ্যাণ্ড রিটার্নড ইনটু একতলা অ্যাণ্ড নাউ আই অ্যাম রিডিং ফর টুমরো।

একটু পরেই ডাইরির ৬ জানুয়ারির পাতায় রঙ্গলালের চোখ আটকে গেল।

মাই 'অটোবায়োগ্রাফি'।

মাই নেম ইজ মল্লিকা সেন। আই রিড ইন ক্লাস টেন। আই হ্যাভ ফ্রেণ্ডস্। আই বর্নড্ অ্যাট

নিচে লেখা—বসুশ্রী—৪৭-৮৮০৮।

রঙ্গলাল পড়ে যাচ্ছিল। ১৩ জানুয়ারির পাতায়—

একটি মেয়ে তার নাম সুমিতা। মেয়েটি খুব ভালো। সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। শী ইজ ভেরি সুইট টু লুক। শী ক্যান স্পিক্ ইংলিশ। শী হ্যাড এ লার্জ মাইণ্ড। শী লাভস মি। অ্যাণ্ড আই অলসো

লাভ হার। শী উইল অ্যালাউড ফর টেস্ট। শী উইল হ্যাভ গিভ দি হায়ার সেকেণ্ডারি এগজামিনেশন। আই উইল নট।

রঙ্গলালের মনে পড়লো, গত বছর তো মলি প্রোমোশন পায়নি। খুব কষ্ট পেয়েছে মনে।

কই ? এসো। শোবে না ?

তুমি শুয়ে পড়ো। বলে রঙ্গলাল খুব মন দিয়ে তার বড় মেয়ের খাতাপত্র দেখতে লাগলো। খানিক বাদে রঙ্গলাল এক বিচিত্র ডাইরির ভেতর দিয়ে যেতে লাগলো।

৪ ফেব্রুয়ারি। বুধবার।

ওয়ান্স আপন এ টাইম আই লাভ্ড মাই ওয়ান ফ্রেণ্ড। শী অলসো লাভ্ড মি। হার নেম ওয়াজ এক্স। বাট আই ফেইল্ড ইন দি এগজাম। অ্যাণ্ড ফ্রম দেন আওয়ার ফ্রেণ্ডশিপ ওয়াজ ডিস্টার্বড। আই রিড ইন ক্লাস টেন। বাট শি রিড্স ইন ক্লাস ইলেভেন। আই ফেইল্ড অ্যাণ্ড ফর দ্যাট....

নিষুতি ঘুমন্ত বাড়িতে মলির জন্যে রঙ্গলালের চোখে জল এসে গেল। আমি তো কোন দিন মলিকে খতিয়ে দেখিনি। আমারও স্কুলে থাকতে আনন্দগোপাল ব্যানার্জিকে খুব ভালো লাগতো। ওর মামা বদলি হয়ে যাওয়ায় ওকেও চলে যেতে হয়। আমি তখন মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

সবুজ কালিতে একটি পদ্মপাতা এঁকেছে মলি। ২৪ ফেব্রুয়ারির পাতায়। পাশে লাল কালিতে লিখেছে—আই লাভ য়ু।

১২ মার্চ মলির জীবনে একটি ভীষণ দিন। সে লিখেছে—

টু ডে ইজ এ হরিব্ল ডে ফর আওয়ার ক্লাস। সাম গার্ল্স অয়ার স সাম বয়েজ টু আউট দি উইণ্ডো। অ্যাণ্ড অ্যাট দ্যাট টাইম এ গার্ডিয়ান ওয়াজ স দ্যাট সাইট অ্যাণ্ড সেইড টু আওয়ার প্রিন্সিপাল। টু ডে অল দি টিচার্স পানিসড শুক্লা। শি ওয়াজ ক্রায়েড্। আই হ্যাড সো গ্রিম, বাট....

আমরাও তো একদিন এরকম করেছি মলি। বাবা হিসেবে তোমার সঙ্গে আমার আরেকটু মেশা উচিত ছিল।

৬ এপ্রিল।

হোয়াট ওয়ে ইজ মেণ্ট বাই দিস্ রোড?

দিস্ রোড মিনস্ দি এনটায়ার পিরিয়ড্ অব এ ম্যানস্ লাইফ। অ্যাণ্ড দি উইণ্ডিং জারনি মিনস্ দি পেরিলিয়াস আওয়ার্স ছাট মেক এ ম্যানস্ লাইফ।

১২ এপ্রিল।

শৈলজানন্দের জন্ম বীরভূমের রূপসীপুর গাঁয়ে। বাবা ক্ষ্যাপাটে লোক ছিলেন। সাপটাপ ধরতেন। সাপ খেলা দেখাতেন। খুব ছেলেবেলাতে বাবা হারান। মানুষ হয়েছেন বর্ধমানে—গাঁয়ে, মামার বাড়িতে। মাতামহ ছিলেন কয়লাখনির মালিক রায়বাহাদুর—অত্যন্ত ধনী। ওঁর স্কুলজীবনের বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে—তখন দুই বন্ধু সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন—

আর পড়তে পারলো না রঙ্গলাল। কালি জেবড়ে গেছে।

এক জায়গায় লেখা—ওয়েফেয়ারার মিনস্—ট্রাভেলার্স।

আরেক জায়গায়—দ্বৌ + অপি = দ্বারপি।

তারপর দু লাইন গান—

সজনি সজনি রাধিকালো দেখ
আবহু চাহিয়া।
মৃদুলগমন শ্যাম আজয়
মৃদুল গান গাহিয়া।

তারপর—

চ বা ছ পরে থাকলে পূর্বের ত ও দ স্থানে চ হয়।

২ জুলাইয়ের পাতায় শুধু একটি কথা লেখা—বাবা।

২৭ জুলাই—দিলীপ পুস্তকং পঠতি।

২৯ জুলাই—একটি হিন্দী গানের কলি—

কভি কভি মেরে দিলমে····

২৪ সেপ্টেম্বর। গুরুজীর কাছে শেখা নাচের বোল্····

তা খিতি তকথৈ তখিতি তা

দ্রুগাতিনি তা····

৬ অক্টোবর—উইস ইউ অল গুড লাক। হেমামালিনী।

৭ অক্টোবর—আই ওয়াণ্ট টু মিট দ্যাট ফেলো ম্যান। হু সেজ দ্যাট আই ডোণ্ট লাভ রাজেশ? অ্যাণ্ড রাজেশ অলসো নেগলেকট্‌স মি? ইজ ইট রাইট?

৮ অক্টোবর—ডিম্পল্ খান্না।

১৩ অক্টোবর—অমিতাভ বচ্চন।

১৫ অক্টোবর—সঞ্জীবকুমার।

এসো। শোবে না?

রুবির কথায় চোখ খুলে তাকালো।

ওমা তুমি কাঁদছো কেন?

মেয়ের খাতাপত্রের গোছা নিয়ে ঘরে উঠে আসার সময় রুবিকে বলল, আলোটা নিবিয়ে দাও।

কাঁদছো কেন?

ফেল করে খুব কষ্ট পেয়েছিল।

তাই বলে তুমি কাঁদবে? বলে হাসতে হাসতে রুবি মশারির ভেতর ঢুকলো। আলো নিবিয়ে দিও। এই তোমার মলিকে শাসন করা!

রঙ্গলাল তখন পড়ছিল—অ্যালজেব্রা খাতায় পাতার পর পাতা। বড় বড় অক্ষরে লেখা—

সুদক্ষিণাদি,

তুমি যদি বিকেলে সুইমিংয়ে না যাও তো আমার কার্ডটা একটু পাঠিয়ে দাও। আমি যাব। কারণ, রাঙাদিরা আসবে। ইতি—

মলি

'কাগজওয়ালা তোমার সাথে আমার দেখা হয় নাই তাই পয়সা

দিতে পারিনি। কুন্তিদির হাতে দুটো সংখ্যার দাম দিলাম। সামনের মাসে আবার দুটো সংখ্যার দাম দেব। তুমি আমায় স্টার ডাস্ট ঠিকমত দিও।'

মধুছন্দা,

নিশ্চয় খুবই ভালো আছিস। আমি এবার পাশ করিনি রে। তুই তো এবার অ্যানুয়ালে থার্ড। তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোদের ছেড়ে কি করে থাকবো, তা আমি নিজেই জানি না। তোরা তো খুব মজা করবি—না রে? এইটথ জানুয়ারি আমার কথা একটু মনে করিস রে প্লিজ। যদি মনে থাকে—না হলে করিস না। দ্যাখ আমি কি করে বাঁচবো তা আমি নিজেই জানি না। আমি আমার বন্ধুদের ভীষণ ভালোবাসি রে। আমার ভীষণ মনে হয়—মধুমিতা আমাকে পছন্দ করে না।

আমায় অনেক টিচারই দেখতে পারে না—তারা এবার বেঁচে যাবে। আমি তো নেই—ক্লাসের মেয়েরাও বেঁচে যাবে। আর কেউ না মনে করুক—তুই আমায় একটু মনে করিস।

এ-জায়গাটায় এসে চিঠির তারিখ দেখে মনে করার চেষ্টা করলো রঙ্গলাল—আমি তো তখন মলিকে বোঝার চেষ্টা করিনি। বরং বকেছি। কী কষ্টই না পেয়েছে মনে। আমি নিজে ক্লাস সেভনে রোল থ্রি—আনন্দগোপাল ব্যানার্জিকে খুব ভালোবাসতাম।

মধুমিতার চিঠি—

মলি,

ভালো চাও তো কালকে স্কুলে আসবে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

মধুমিতা

মাই ডিয়ার মলি,

আশা করি ভালো। আমরা ভালো। তুই এসে দেখা করে যাস। অনেক কথা আছে। রাজশ্রী হস্টেল ছেড়ে দিচ্ছে। আর কি? পরে

চিঠি দেব। লিলি ভাইসক্যাপ্টেন হয়েছে। স্পোর্টসে আসিস। থার্টিফার্স্ট হবে।

উইথ লাভ—

এবারে মলি—

ডিয়ার মধুমিতা,

তোকে কিসে চিঠি লিখবো বুঝতে পারছি না। ইংলিশে? আচ্ছা চার লাইন লিখছি।

হাউ আর ইউ। ফর ইওর না থাকার জন্য ভেরি লোনলি ফিলিংস অ্যাণ্ড অলওয়েজ একটা স্যাডনেস ইন দি মাইণ্ড অব অল দি গার্লস। ইওর ডেস্ক ইজ ভেরি খালি। ফর দ্যাট রিজ্‌ন আই ডোণ্ট গো টু স্কুল ইন মনডে টু থার্সডে পর্যন্ত।

এবার বাংলায় লিখি? হ্যাঁ?

আচ্ছা শোন্ তোর এখন রাজশ্রীর কথা মনে পড়ছে না বারবার?

পড়ারই কথা। এই হলো ঠাকুরের লীলাখেলা।

আরেকজনকে লিখেছে মলি—

ডিয়ার মৌসুমী,

তুই আমাদের বাড়িতে আর আসিস না কেন? আমাকে যে এখন সবাই ভুলে গেছে তা আমি এখন খুব ভালোভাবে জানি।....

এক জায়গায় লেখা—

খুশির ডায়েট

সকালে দুধ ও পাঁউরুটি।

বেলা ১০টায় বিস্কুট ২টি।

বেলা ১২টায়—কিমা ও ভাত।

বিকাল ৫টায়—কিমা ও ভাত।

রাত ৮টায়—বিস্কুট।

রাত ৯-৩০টায়—দুধ ও পাঁউরুটি।

বনিসন সিরাপ—সকালে বিকালে ভাত খাওয়ার পর এক চামচ করে।

ডিসটেমপার ইনজেকশন।

ডক্টর জগৎ বসু—ইলেভেন এ. এম.। রবিবার।

রনি নার্সিং হোম

ডেট অব বার্থ—২১ মার্চ। এর পরেই অ্যালেজেব্রার একুশ প্রশ্ন-মালার অঙ্ক।

তারপর—

প্রিয় জয়াদি,

তোমার অ্যাকটিং আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি তোমাকে ভীষণ লাইক করি। তোমার স্বামীকেও খুব করি। তোমার বাংলা ও হিন্দী ছবি প্রায় সবই দেখেছি। দারুণ লেগেছে। তুমি আমাকে তোমার সব রকম ছবি পাঠিও। স্বামীরও পাঠিও। তুমি খুব ভদ্র তাই আমার ভীষণ ভালো লাগে। তুমি কেন রাজেশের সঙ্গে পার্ট কর না? ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। তুমি কি ছোটবেলায় খুব ডানপিটে মেয়ে ছিলে? সঁতার-টাতার জানো নাকি? তোমার অভিমান দেখেছি। এত ভালো বই জীবনে মনে হয় দেখিনি। মাঝে গুজব উঠেছিল—রীতা ভাদুড়ি নাকি তোমার বোন। সত্যি নাকি? তোমার বাবা তো খুব বড় লেখক ছিলেন। অমিতাভর ভাইয়ের নাম কি? অবিশ্যি আমার অমিতাভ নামটা বলা উচিত না। কেন জানি না এত ভালো লাগে যে, দাদা বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। তোমার যদি কোন সোর্স থাকে তাহলে আমাকে প্লিজ সিনেমায় নামিয়ে দিও। হয়তো তুমি আমার এই চিঠি পড়বে না। কিন্তু না লিখে পারলাম না। তোমার বাওর্চি দারুণ হয়েছিল! হয়তো একটা কথা বলব—কিছু মনে কোরো না—তোমার সব গুণ আছে—কিন্তু তুমি খুব একটা ভালো নাচ জানো না। এটা যা মনে হয় করো। তোমার দারুণ নাম—আমাদের স্কুলে। তুমি নাকি দারুণ এডুকেটেড। প্রচুর বানান ভুল আছে। কিছু মনে কোরো না।

অমিতাভদাকে দেখতে চাইলে দেখতে দিও। ওনাকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানিও। অভিমানের সেই সবুজ মোজা দুটো কি আসরাণীর বাচ্চার কাজে গেল? সেটা কি সত্যি তুমি বুনেছিলে?

ইউ আর এ ভেরি গুড গার্ল। আই লাভ ইউ। তোমার অভিমান দেখতে দেখতে আমার কান্না বেরিয়ে গিয়েছিল। প্লিজ তুমি আমার সঙ্গে চিরজীবন কানেকশন রেখো। আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। আর অভিমানের লং প্লেইংটা পাঠিও। দারুণ খুশী হবো। জানো? আমাদের কুকুরের নামও খুশি।

আচ্ছা জয়াদি, তোমরা সিনেমায় কাঁদো কি করে? ভীষণ আশ্চর্য লাগে। হাজার লোকের সামনে তোমরা কাঁদো কি করে?

তোমার বাচ্চা কেমন আছে? একদিন আমাদের বাড়িতে এসো তোমার বাচ্চাকে নিয়ে যদি না শুটিং থাকে। অমিতাভদাকে বোলো নেমকহারাম খুব ভালো লেগেছে। তবে ভীষণ কষ্ট হয়েছে—রাজেশদাকে খুন করলো কেন? ভীষণ খারাপ ছেলে তোমার স্বামী। তোমার মেয়ে হলে নাম দিও ঈশানী। আর ছেলে হলে নাম দিও অসিত।

আমি ভীষণ পাকা মেয়ে। ক্লাস কেটে সিনেমা দেখি। বাবা মায়ের কাছে মার খাই তবু তোমায় ভুলতে পারি না।

আই এণ্ড মাই লেটার উইথ লটস্ অব লাভ অ্যাণ্ড কিসেস।

মাঝখানে একখানা খোলা পোস্টকার্ড। তাতে মৌসুমী লিখেছে—

মলি তুই অন্য স্কুলে চলে গিয়েছিস—আমরা যেন কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছি।

এরপর মলি মধুছন্দাকে লিখেছে—

আমার পক্ষে আর সিনেমা দেখা সম্ভব নয়। যদি ভালোভাবে পাস করি—তাহলেই সম্ভব হবে। তবে আয়না আসছে····১৭ তারিখে ভাবছি একটা সিনেমা দেখব। টাকার চেষ্টা চলছে। আমার না তোর কথা সব সময় মনে পড়ে। আমি এখন এই নতুন স্কুলের লাইফ স্টুডেন্ট। জীবনেও পাস করবো না। তুই আমার অত্যন্ত ভালোবাসা নিস। তার কোনো

শেষ নেই। আমার মা বাবা এক্ষুনি বেরিয়েছে····

এরপর এক জায়গায় চোখ পড়তেই রঙ্গলালের চোখে জল এসে গেল। মলি বড় বড় করে লিখেছে। আমার মেয়ে এত অল্প বয়সে এত দার্শনিক হলো কি করে?

মনে আছে মজার দিনগুলো
পড়াশুনো করলে আবার
ওই দিন ফিরে আসবে

তার নীচে একখানা চিঠি—

প্রিয় অম্বালিকা,

তুই কেমন আছিস? শুনলাম তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস। কেন? —জানিস সিক্সস্থ মার্চ আমেরিকা চলে যাচ্ছি। ওখানেই পড়াশুনো করবো। বাবা যাচ্ছে। বাবার সঙ্গেই চলে যাচ্ছি। তোদের ছেড়ে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু বন্ধু তো শুধু মজার সময়। কাজ হয়ে গেলেই কেউ আর কাউকে চেনে না। তোর কথা আমার সব সময় মনে থাকবে।····

রঙ্গলাল মনে মনে খুঁজছিল, মলি এত আগে থেকে কোথাও চলে যাওয়ার সুর ধরে ফেললো কি করে? পরের পাতায় একটা সরল অঙ্কের নিচে—

টু মিস চুলবুল,

৫০, জওহরলাল নেহরু রোড

কলকাতা

ডিয়ার ম্যাডাম,

আর ইউ এ ঘোস্ট অর ম্যাড্?

ইওরস ফেইথফুলি
প্রাইম মিনিস্টার
(মলি)

তার নিচেই আরেকখানা—

বাবা,

আমি নাচের স্কুলে যাচ্ছি। ওখান থেকে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আমার নেমন্তন্ন। যেতে হবে তাই যাচ্ছি। আমি এসে পড়তে বসবো। আর তুমি মাকে বলেছো, আমি রোজ হাঁটতে বেরোই—এটা তোমার ভালো লাগছে না। সামনের সপ্তাহে আমি বেরোব না। তোমার সন্দেহ কাটার পর আবার বেরোবো। কাগজওয়ালা এলে স্টার অ্যাণ্ড স্টাইলটা ফেরত দিয়ে দিও। যাদের বাড়ি যাচ্ছি—তারা বাড়িতে চার বোন ও মা থাকে। সামনের রবিবার নাচের স্কুলে তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। ইতি—

এর পরে তিনখানাই খুব ইণ্টারেস্টিং—

শ্রদ্ধেয়

সৌমিত্রবাবু,

আমি আপনার অনেক সিনেমা দেখেছি। আমার ভীষণ ভালো লাগে আপনাকে। চাক্ষুষ দেখা তো হবে না। তাই আপনার একখানা ফুল ফটো আশা করি। ছুটির ফাঁদের ট্রেলার দেখলাম। এত ভালো লেগেছে।—আপনাকে তা আর বলে বোঝানো যাবে না। আমার বাড়ির সবাই আপনাকে খুব পছন্দ করে। আমি যদি সিনেমায় চান্স পাই, তো আপনার সঙ্গে একটা সিনেমা করব। আমার নাম

ডোরা। আমি ক্লাস টেনে পড়ি

আপনার ফ্যান—ডোরা।

শ্রদ্ধেয়া মিস দে,

প্রথমেই আপনি আমার বিজয়ার প্রণাম নেবেন। ক্লাস সেভেনে আপনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। তখন একদিন বুঝিয়েছিলেন যে—বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার থেকে আসেনি। আপনি একটি চার্ট করে বুঝিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে সবার তর্ক হয়। কেউ কথাটা ধরতেই চায় না। আর আমার চার্টটা খুব অল্প মনে আছে। আপনি যদি দয়া করে আমায় একটু বুঝিয়ে দেন তো আমার খুব সুবিধে হয়।

স্কুলের মধ্যে আপনাকে, মিসেস মণ্ডলকে, মিস ঘোষকে মিস করকে, মিসেস মিত্রকে, মিসেস সেনগুপ্তকে আমার খুব ভালো লাগতো তাই আপনার কাছে ভরসা করে আমি চিঠি লিখছি। আপনি আমায় যেখানে দেখা করতে বলবেন—আমি সেখানেই দেখা করব। আমার ফোন নম্বর ....অসুবিধা হলে আপনি ফোনে জানাবেন। আজ শেষ করি—

যাকে আপনারা পছন্দ করতেন না!

সেই 'মলি'

শ্রদ্ধেয়
সত্যজিৎ রায়,

আপনি নেক্স্ট যে-বইটি করবেন প্লিজ তাতে আমায় নেবেন। আমার খুব সিনেমা করার ইচ্ছে। আর সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে আপনার বই করা। আপনি যেসব পরিচ্ছন্ন বই করেন, তাতে আমার করতে সত্যি ইচ্ছে করে। আপনি যদি বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারি। আপনার বইতে আমার কাজ করার ইচ্ছে।

আপনার 'সোনার কেল্লা' সম্পর্কে আমার কিছু কক্তব্য আছে। আমি স্কুলে পড়ি।

ইতি—

রঙ্গলালের চোখ জড়িয়ে এল। শেষ রাতে মসজিদের মাইক থেকে আজানের প্রথম সুর ঘুমন্ত কলকাতার ওপর লাফিয়ে পড়লো। রঙ্গলাল উঠে দেখলো, খুশিকে পাশবালিশ জ্ঞানে জড়িয়ে ধরে মলি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কুকুরটাও বলিহারি। একদম মানুষের পোজে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

এই কুকুর কোনদিনও বাড়ি পাহারা দেবে না। এত সুখী।

৭

খুশি সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। সব মিলিয়ে এক লক্ষ দশ হাজার ছেলেমেয়ের ভেতর। স্টেটসম্যান, যুগান্তর—ছবি নিয়ে গেল। দৈনিক প্রভাতের রিপোর্টারের সঙ্গে বসে মলি কথা বলছিল। তার কোলে খুশি বসে আছে।

কে পড়াতো খুশিকে?

আমিই দেখিয়ে দিয়েছি মাঝে মধ্যে।

আপনি তো ক্লাস টেনে পড়েন।

তাতে কি হয়েছে? খুশি আমার খুব ব্রেইনি। একবার বললেই মনে থাকে ওর।

দৈনিক প্রভাতের ফটোগ্রাফার রিপোর্টারের হাত ধরে বেরিয়ে যাবার আগে পটাপট তিনটে ছবি নিল খুশির।

ওরা আসবার আগে এসেছিলেন সেকেণ্ডারি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। তিনি খুশির মার্কশিট দিয়ে গেলেন। নম্বর দেখে তো মলির চক্ষুস্থির। করেছিস কি খুশি। আমি তো সারাজীবনেও এত নম্বর পাইনি।

রুবি বিকেলবেলা ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়। ভাতঘুম তাকে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। জুলাই মাসের শেষ দিককার বিকেল। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। কেমন একটা শীত শীত ঠাণ্ডা বাতাস। তার সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেয়েরা দুজনই স্কুলে যায়নি। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের মাঝখানে খুশি বাঘের পোজে বসে। বাজের আওয়াজ একদম সহ্য করতে পারে না। তাই খাটে গিয়ে উঠেছে।

সারা আকাশ অন্ধকার। বাড়িটা নিঃঝুম। শুধু খুশি জেগে বসে আছে। মেয়েদের ডেকে তুলে দেওয়া দরকার। যা রেজাল্ট—তাতে

এখন থেকে নিয়মিত পড়লে তবে পাস করতে পারে। ডাকতে গিয়েও ডাকলো না রুবি। একা একা বারান্দার বেঞ্চে বসে থাকলো। তিন হাতের ভেতর বৃষ্টি। কত যে ফোঁটা। গুণে দেখার কেউ নেই।

রঙ্গলালের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই কেন? কতদিন কোন কথা হয় না আমাদের।

মণি লোহার রেলিংয়ের বাইরে ছুটছিল। এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে। আছাড় খেতে খেতে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। রেলিংয়ের ভেতর পাশাপাশি তিনটে ঘোড়া দৌড়চ্ছে। ন' নম্বর, এগারো নম্বর আর তিন নম্বর।

মণি কি করে ছুটন্ত ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে পারবে। তবু সে দৌড়োচ্ছিল। তার পেছনে—তার সামনেও ছুটন্ত লোকজন। সবাই ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। এক-জায়গায় এসে পাশের লোকটার পায়ে পা জড়িয়ে গিয়ে দুজনেই ছিটকে পড়ে গেল। ততক্ষণে ছুটন্ত। লোকজনের ভিড়টা তাদের মাড়িয়ে দিয়ে সামনে ছুটে চলে গেল।

মণি উঠে বসতে বসতে রেস শেষ। রেলিংয়ের বাইরে সেইসব ছুটন্ত লোকজনের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনেকে হেঁটে, মাঠ ভেঙে রাস্তায় ওঠার পথ খুঁজছে। দৌড়োবার সময় খেয়াল ছিল—কোথায় এসে পড়েছে।

মণি উঠে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে চললো। ভবানীপুরে মোহিনীমোহন রোডে বুকির ঘরে তিয়াত্তর টাকা জমা দিয়ে একখানা চিরকুট পেয়েছে॥ চোরা গুপ্তা বুকি। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই কোন। হাঁটতে হাঁটতে মণি যখন রেসকোর্সের পেটে—তখন আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর একখানা সন্ধ্যে। গেটের মুখে একটা ছোট জটলা। তার কাছাকাছি গিয়ে মণি যা শুনলো—তাতে তার কান গলা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে গেল। নাক দিয়ে গরম বাতাস বেরিয়ে আসতে লাগলো, একবার পেচ্ছাপ করা দরকার। কিন্তু কাছাকাছি কোন

আড়াল নেই। মণির কানের ভেতর দিয়ে তখনো গরম সিসে পাশ করছিল। সেই অবস্থাতেই সে এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের দিকে হাঁটা শুরু করে দিল। যাবে মোহিনীমোহন রোডে।

মণি এখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না—তার জ্যাকপট মিলে গেছে। জটলার মুখে একটু আগে যা শুনলো তাতে তো তাই হয়। তিয়াত্তর টাকায় কত পাবে? একশো গুণ? এর আগে সে কোনদিন রেস খেলেনি। একদম আন্দাজে ঘোড়া ধরেছে।

সকাল সকাল আজ অফিসে এসেছে রঙ্গলাল। ডেসপ্যাচে ফোন করলো। ওপাশ থেকে রঞ্জিৎ ধরেছে। বাইরের এজেন্টদের অর্ডারের চিঠি ও খোলে। টাউনের আনকোরা খবরও ছেলেটি রাখে।

ফোন ধরেই রঞ্জিত বলল, সব জায়গাতেই কমছে। বাইরে সব জায়গাতেই।

টাউনে?

এক নম্বর টাউন কণ্ট্রাক্টর দু' হাজার কমিয়ে দিল আজ থেকে। কিরকম খবর দিচ্ছেন? একটু গরম খবর বাড়িয়ে দিন। তাহলে সার্কুলেশন যা পড়ছে—তা খানিকটা ঠেকানো যাবে।

সেকথায় না গিয়ে রঙ্গলাল বলল, দু'নম্বর কণ্ট্রাক্টর—নিত্যানন্দ কি বলছে?

কমায়নি। তবে বলছিল, আর ধরে রাখা যাবে না—মাসকাবারি গ্রাহকদের। সবাই ওদের কাগজের দিকে ঝুঁকছে।

রঙ্গলালের শরীরের ভেতর রক্ত টগবগ করে উঠলো। ওদের কাগজ, ওদের নিউজ—এসব খবর দৈনিক প্রভাতের সবাই জানে। জানে না শুধু প্রভাতের নিজের খবরটুকু। নিত্যানন্দ দু' নম্বর টাউন কণ্ট্রাক্টর। তার এরিয়ার ভেতর কলোনি এলাকাই বেশি। ওখানে দৈনিক প্রভাত চিরকালই এক নম্বর কাগজ।

ফোনটা নামিয়ে রাখলো। সামনেই নিউজরুম। বেলা একটা হবে। টেলিপ্রিন্টার অবিরাম কাগজ উগরে চলেছে। মফস্বল ডেস্কে সাবএডিটর হেমন্তবাবু করেসপনডেন্টদের পাঠানো খবর লাল কালি দিয়ে কাটছিলেন আর হেডিং করছিলেন।

সিলিং থেকে মাকড়শার লম্বা লম্বা ঝুল। পাখাগুলোর ব্লেডে ধুলোর গুঁড়ো পুরু হয়ে জমেছে।

মেশিন থেকে ইঞ্জিনিয়ার গুপ্তমশায় ফোন করলেন। প্রিন্ট অর্ডার তো সুবিধের নয়। এরপর তো রঙ্গলালবাবু এমন সময় আসতে পারে—সার্কুলেশন ড্রপ করে করে একদিন এত কম প্রভাত ছাপতে হবে যে মেশিন স্টার্ট করতে না করতেই ছাপা শেষ। পাবলিক খাবে এমন জিনিস দিন।

ফোনটা নামিয়ে রেখে সকালের ডাক দেখছিল রঙ্গলাল। এজেন্টদের পাঠানো কিছু পোস্টকার্ড তার ডাকের সঙ্গে এসে গেছে।

যেমন বুদ্বুদের এজেন্ট লিখেছে—রিডিউস সেভেন কপিজ।

দীনহাটা লিখেছে—এগারোখানা কাগজ এই রবিবার হইতে কমাইয়া দিবেন।

তেহট্ট লিখেছে—সোমবার হইতে দৈনিক প্রভাত দুইখানির বেশি পাঠাইবেন না।

রঙ্গলালের পরিষ্কার মনে আছে—ছ মাস আগেও এই তেহট্ট রোজ তেতাল্লিশখানা করে প্রভাত নিত।

ডান হাতের ড্রয়ার হাঁটকাতে লাগলো রঙ্গলাল। কাজের সময় যদি দরকারী জিনিস কাছে পাওয়া যায়। গত বছরের এজেন্সি হিসেব সে একটা পেয়েছিল। বনগাঁ থেকে বিষ্ণুপুর—সব জায়গার একটা মোটামুটি হিসেব ছিল তাতে।

ড্রয়ার হাতড়াতে হাতড়াতে অন্য একটা কাগজ উঠে এলো। মলির হাতের লেখা। যেন মৃণাল সেন মলিকে চিঠি লিখেছেন। এই ভাবেই চিঠিখানা মলি লিখেছে। রঙ্গলাল চিঠিখানা অফিসে এনে রেখে দিয়েছে।

—কারণ, মৃণালবাবু কোনদিন এদিকে এলে তাঁকে দেখাবে। এই ভেবেই রেখে দেওয়া।

মিস মলি,

আমি একটি বই পরিচালনা করছি। আপনাকে তার নায়িকার রোল দিতে পারলে আমার বিশেষ সুবিধা হবে। আপনাকে ওই রোলটা বিশেষভাবে স্যুট করবে। এইজন্য আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আপনার মতামত ও কবে কোথায় দেখা করতে আপনার সুবিধা আছে জানাবেন।

ইতি—

বিনীত—

এম. সেন

পুনঃ—আপনার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি নিজের কথাতে রাজী এবং আপনার মতামত জানতে বলেছেন।

চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিয়ে দু' হাতে নিজের চোখের মণি চেপে ধরলো রঙ্গলাল। এই আমার ফিউচার। দৈনিক প্রভাত হলো সেই রুগী—যাকে ইঞ্জেকশন ফুঁড়েও সিধে রাখা যাচ্ছে না। মলি হলো সেই সন্তান—যে ফেলের দিকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। তার জন্যে কোন লজ্জা বা ভয়—মলির ভেতর নেই।

রঙ্গলাল চেয়ার ছেড়ে নিচে নেমে এলো লিফটে। একতলায় সিলিংয়ের কাছে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের অয়েলপেন্টিং। সম্ভবত আগের সেঞ্চুরির কোন আর্টিস্টের আঁকা। চোখ দুটি জ্বলছে। সাধারণ অবস্থার মানুষ ছিলেন। গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাগজে চিঠি লিখেছেন। আবার কলকাতায় সাধারণ পোশাকে লাটসাহেবের ঘরে চলে যেতেন। ধর্মভীরু সাহসী কল্পনাবীর এই মানুষটি কত সামান্য থেকে এতবড় প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে গিয়েছিলেন। কেরোসিনের আলো, পায়ে চালানো ট্রেডল মেশিন দিয়ে মানুষটি কত কি করে গিয়েছেন।

আর আমার হাতে টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, রোটারি—কত কী।
আমি কি করলাম ? আমাকে টাকার জন্যে চিন্তা করতে হবে না। তবু আমি পারছি না কেন ?

আগের সেঞ্চুরিতে তিনি গালগল্প ছাপেননি। কিংবা পাবলিক যা চায়—শুধু তার জোগান দেননি। বরং জনরুচি তৈরি করেছেন। আদর্শের একটা খসড়া পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। স্বাধীন জাতি হওয়ার পক্ষে দাবি তুলতে গেলে যা যা দরকার—জনরুচি যা হওয়া উচিত—তারই আয়োজন করে গিয়েছেন।

সেখানে আমি কি করলাম ? বার বার আমায় শুনতে হচ্ছে—আনকোরা লেখকদের বাই লাইন দিয়ে কলম ছেপে প্রভাতের ক্ষতি হচ্ছে। সেই মান্ধাতার আমলের কয়েকটি নাম ছাপবার জন্যে—তাদের লেখা বেশি দিয়ে কিনে নিতে প্রভাতের আপত্তি নেই। কিন্তু টাটকা, তাজা কলম লিখিয়েদের লেখা কিনতে গেলেই হাত দিয়ে কিছু গলতে চায় না প্রভাতের। অথচ এদেরই তো তৈরী করে নিয়ে প্রভাতকে এগোতে হবে। তখন প্রভাত আর খদ্দের থাকবে না। প্রভাত তখনও এই বাজারের তোলা তুলবে রোজ। এই আমি চাই। এই পথেই আমি এগোচ্ছি।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রঙ্গলাল মৌলালি এসে পৌঁছলো। সেখান থেকে গোরাচাঁদ হাসপাতাল। তারপর দরগা রোড। এখানেই তো বড় পীরের থানের পাশের গলিতে নিশীথ চাকলাদার থাকতেন। এখনো কি আছেন ? না, বাড়ি পালটিয়েছেন ? কিংবা পৃথিবী ছেড়ে যাননি তো ? কে জানে ! মাস ছয়েক আগে একদিন নিশীথদা তার তৈরী কাপড় কাচা সাবানের বিজ্ঞাপন দিতে এসেছিলেন প্রভাত অফিসে। যদি কমিশন বাদ দিয়ে সস্তায় বিজ্ঞাপন করা যায়—এই আশায়।

নিশীথদাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল রঙ্গলাল। নিশীথ চাকলাদার যখন দৈনিক প্রভাতের দোর্দণ্ড প্রতাপের নিউজ এডিটর—তখন রঙ্গলাল গোডাউন ক্লার্ক।

পড়ন্ত প্রভাত থেকে নিশীথদা যেদিন চলে যান—সেদিন তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়নি। টিফিনের কৌটো হাতে তিনি চলে যান। তাঁর চলে যাওয়াটা রঙ্গলালের চোখে ভাসে। অনেক লোকের অনেক কল্পনা—অনেক স্বপ্ন নিয়ে তবে দৈনিক প্রভাত। এইভাবেই খবরের কাগজ হয়। তাঁর চেয়ারে এখন সে নিজে। সেও পড়তি সার্কুলেশনকে রুখতে পারছে না। সব সময় বিক্রির ওপর বিজ্ঞাপন নির্ভর করে না ঠিকই। কিন্তু প্রভাতের রিডারশিপ প্রোফাইল এমনই যে—তার পাঠকরা টি. ভি., টি· শার্ট কিংবা রেকর্ড প্লেয়ার যে কেনে না—তা ব্যবসায়ীরা সবাই যেন জেনে গেছে। বিজ্ঞাপনটাও যে এখন আছাড় খাবে—কে ভেবেছিল !

বাড়ি চিনে এগোতেই রঙ্গলাল নিশীথদার মাথাটা দেখতে পেল। জনাপাঁচেক লোক নিয়ে বিরাট কড়াইয়ে কি যেন জাল দিচ্ছেন।

এক ডাকেই বেরিয়ে এলেন। এসো এসো। আর বোলো না। কুটিরশিল্পে যে এত ঝামেলা—তা কে জানতো আগে। সাবান বানাতে গিয়ে ট্যালো পাচ্ছি না। বড় ব্যবসাদরা আগেভাগে দাদন দিয়ে রাখে। বসো।

একথা সেকথার পর রঙ্গলাল বলল, প্রভাত দেখছেন ?

নিশ্চয়। ঝিমিয়ে পড়েছো কেন রঙ্গলাল ? মনে রেখো খুদে খুদে ছাপার অক্ষর এক একটি সোলজার। এরাই তোমায় জিতিয়ে দেবে। আবার ওরাই হারিয়ে দিতে পারে।

আপনাদের আমলেই তো প্রভাত সবচেয়ে বড় হয়েছিল।

তা হয়েছিল। অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছিলো তখন। লেগে থাকলে তুমিও পারবে রঙ্গলাল।

আপনার আমলের শেষদিকে বড় বড় করে পার্টি বসদের ছবি, জন্মদিনের রিপোর্ট ছেপে প্রভাতের এখন রসাতল দশা।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। স্পট আইটেম দিয়ে যাও। নতুন ছেলেকে দিয়ে লেখাও। কপিতে ফ্রেসনেস থাকা চাই। আমি তো গাড়িঘোড়া

চড়িনি তখন। পায়ে হেঁটে অফিস যেতাম। আর রাত একটা নাগাদ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। বিটের পুলিসরা সবাই আমায় চিনতো।

ওঠবার সময় রঙ্গলাল বলল, ট্যালো কথাটা শুনেছি। জিনিসটা কি বলুন তো?

সাবান বানাতে লাগে। কষাইখানা থেকে চর্বি নিয়ে গিয়ে বানায়। সভ্যতার গাদ বলতে পারো।

রাতে শুয়ে পড়েছিল রঙ্গলাল। খুশিকে আজকাল বারান্দায় বেঁধে রাখা হয়। নয়তো সে মলি-ললিদের ঘরে চলে যায়। টেলিফোন বেজে উঠলো। এত রাতে নিশ্চয়ই প্রেস থেকে।

হ্যালো?

রঙ্গলালবাবু বলছেন?

হুঁ।

হামাকে আপনি চিনবেন না।

কি ব্যাপার বলুন—

আপনার মেয়ের ব্যাপারে। বড় মেয়ের ব্যাপারে বলছি—

তা এত রাতে?

হাপনাকে ফোনে পাই না। সব সময় বাইরে বাইরে চলে যান।

রঙ্গলাল মনে মনে ভাবলো, মেয়ে বড় হলে তাহলে কতদিকে জ্বালা।

বলুন।

হামি আপনার পাড়ারই ছেলে।

বলুন না কি বলবেন।

সে আপনার মেয়ে মেনকা সিনেমার সামনে থেকে তিনটে ছেলেকে গাড়িতে তুলেছে কাল।

আমার ড্রাইভার তো বলেনি।

সে ওই ছেলেগুলোর ভয়ে বলতে পারেনি। বললে মেরে দেবে। এক টাকার চিনেবাদাম কিনে লেকের ভেতর গাছতলায় বসে খেয়েছে।

মণি কোথায় ছিল ?

সে তো গাড়িতে বসে থেকেছে। নইলে আপনার মেয়ে ভি তাকে মারবে। বলুন আপনি—ব্যাটাছেলে হয়ে ওপেন রোডে মেয়েছেলের হাতে মার খেতে কেউ রাজী হয় ?

ঠিকই তো।

গাড়িতে করে আপনার মেয়ে ওদের নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যেতে চেয়েছিল।

তারপর ?

আপনার ড্রাইভার ছেলেটা ভাল আছে। বনেট খুলে দিয়ে ইঞ্জিনে খুটখাট করেছে। বলেছে—গাড়ি খারাপ। এই সন্ধ্যেবেলা সোজা বাড়ি গিয়ে মিস্ত্রিকে দেখাতে হবে গাড়ি।

রঙ্গলালের মনে পড়লো, ঠিকই তো। কাল সে গাড়ি নেয়নি। হেঁটে হেঁটে পথের দু-ধারের লোকজন দেখতে দেখতে সে অফিসে গিয়েছিল।

ছেলেটা কে ? মনে হচ্ছে মণির খুব চেনা। রঙ্গলাল বলল, আপনার ঠিকানা ? নাম ?

লাইন কেটে গেল।

ফোনটা রেখে এসে শুয়ে পড়লো রঙ্গলাল। কাল মণিকে বলবে, তোর কোন হিন্দুস্থানী বন্ধু আছে ?

শুয়ে শুয়ে মশারির ভেতর ঘুম আসছিল না রঙ্গলালের। জোড়া বালিশে শুতে শুতে ঘাড়ে স্পনডুলাইটিসের ভাব এসেছে। ছেলে নেই তার। প্রথম সন্তানটিই এ রকম। লোকের এই বয়সের ছেলে বাবার সুবিধে অসুবিধে বোঝে। ওকে সে সব বলে কোন লাভ নেই।

ক'দিন আগে সন্ধ্যেবেলা এসপ্ল্যানেড দিয়ে মণি গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল। বেশ জোরে। ট্র্যাফিক সিগনাল গ্রিন। গাড়ির পর গাড়ি পড়িমড়ি ছুটছে। তার ভেতরে পুলিসের তাড়া খাওয়া একটা মেয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ধরা পড়ার ভয়ে ছুটন্ত গাড়ির জঙ্গলে এলোপাথাড়ি ছুটছে। যে কোন মুহূর্তে ধাক্কা লেগে মেয়েটা পড়ে যেতে পারে।

তখন কেন জানি তার মণির কথা মনে পড়েছিল। সে একজন বাবা।

৮

'লেটার্স টু দি এডিটর' এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের হাত থেকে নিউজডেস্কে আনা হয়েছে। একজন নতুন ছেলের হাতে দিয়ে রঙ্গলাল খানিকটা নিশ্চিন্ত। নয়তো এতদিন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ভদ্রলোক পাঠকদের চিঠিগুলোকে 'অনুরোধের আসরের' মত ছেপে এসেছেন। তাতে চারের পাতার না এসেছে কোনো চরিত্র—না এসেছে কোনো ঝাঁজ।

নতুন সাব-এডিটর ছেলেটি কয়েকখানা চিঠি এনে রঙ্গলালের টেবিলে রাখলো। একখানা চিঠি বেশ ইণ্টারেস্টিং। দেখুন।

দেখছি। তুমি ভাই হেলথ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমায় শিশুমৃত্যুর হার একটু জেনে দাও না।

চিঠি দেখতে দেখতে একখানা চিঠিতে রঙ্গলালের চোখ আটকে গেল। শেষে সই রয়েছে—ডক্টর জগৎ বসু।

চিঠিখানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিনবার পড়লো রঙ্গলাল। নিজের মনে মনেই বলল, বাঃ! সুন্দর কপি তো। গুড্ রিডিং মেটিরিয়াল।

একটা কথাও না পাল্টে হেডিং করলো—

কলকাতাকে সভ্য করে তুলতে ডক্টর জগৎ বসুর পদার্পণ

তারপর কপির পাশে পয়লা পাতায় খবরটা বসাবার নির্দেশ লিখলো। একজন রিপোর্টার পাঠালো জগৎ বসুর ঠিকানায়। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট এ-খবরের পাশে বসাতে হবে। ফটোগ্রাফার গেল—তার ছবি আর তার হস্টেলের ছবি তুলতে।

যা হয় হবে। রঙ্গলাল ঠিকই করে ফেললো, জগৎ বসুর ব্যাপারটা

সে কালকের টাউনের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকটা আগাগোড়া ভরাট করে ছাপবে। দরকার হলে প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনও তুলে দেবে।

এ রকম কপি হাতে এলে কি রকমের একটা উত্তেজনা রঙ্গলালকে জাপটে ধরে। কর্পোরেশন স্ট্রীট ডগের হিসেব আনতে লোক পাঠালো। তাকেই যাবার সময় বলে দিল—এস. পি. সি. এ. অফিসে ঘুরে এসো কিন্তু। কুকুর কামড়ালে হাসপাতালের ব্যবস্থা কি—তাও জানবে।

অনেকটা যুদ্ধ চালানোর মত। চারদিক থেকে পাঠকের মনের জগৎটাকে আক্রমণ করাই তার কাজ। সবটুকু মনোযোগ কেড়ে না নিতে পারলে কোনো খবরই বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

একটা তিন কলমের বাক্স করতে হবে পরশুর কাগজে। হেডিং হবে ছত্রিশ পয়েণ্টের, খুব সরল হেডিং—

সভ্যতার গাদ

কলকাতায় রোজ কত পশু বলি হচ্ছে? সরকারী আর বেসরকারী। কতটা চর্বি সাবান শিল্পের চাই? কতটা চর্বি হলে তবে আমাদের জামা কাপড় ফর্সা রাখতে পারা যাবে? সেজন্যে বছরে কত পশুকে বলি দিতে হবে? ইত্যাদি পয়েণ্টসগুলো রেডি করেছে রঙ্গলাল—আজ সপ্তাহখানেক ধরে।

'সভ্যতার গাদ' খবরটা বেরোতেই চিঠি আসতে লাগলো। গাদা গাদা। চিঠি আসা কমে গিয়েছিল একদম।

জগৎ ডাক্তারের খবরটা ছাপবার পর থেকেই কুকুরপ্রেমী আর কুকুরবিদ্বেষীরা চিঠি পাঠাতে শুরু করল।

তারপর থেকে রঙ্গলাল লক্ষ্য করে আসছে—'সভ্যতার গাদ' খবরটা বেরুতেই সাবান শিল্পের জন্যে কষাইয়ের কাছ থেকে চর্বি সংগ্রহের বিরুদ্ধে যাঁরা চিঠি লিখলেন—তাঁদের অনেকেই এর আগে কুকুরপ্রেমী হিসেবে প্রভাতে চিঠি লিখেছেন।

প্রেমিক ও বিদ্বেষী, সভ্যতা ও তার গাদ—এই দু ভাগে কলম-রুল

দিয়ে আলাদা করে পাঠকদের দু-তরফের চিঠি ছাপতে লাগলো রঙ্গলাল।

খনি দুর্ঘটনায় অনেক খরচ করে রিপোর্টার পাঠিয়ে রিপোর্ট ছেপে দৈনিক প্রভাত যে সাড়া পায়নি—পাঠকদের চিঠি ছেপে তার দ্বিগুণ সাড়া পেতে লাগলো প্রভাত। ডেসপ্যাচের কমলাক্ষবাবু বললেন, কি ব্যাপার ? টাউনের বাড়ছে। মফস্বলে বাড়ছে। কি এমন খবর দিচ্ছেন।

রঙ্গলাল চুপ করে থেকেছে।

সন্ধ্যের দিকে রঙ্গলাল একা একা বসে সারাদিনের ডাকের চিঠিগুলো পড়ছিল। শিয়াখালার একজন প্রাথমিক শিক্ষক চিঠি লিখেছেন। দেশ আমাদের কি দিয়েছে ?

টেবিলে ছায়া পড়তেই চোখ খুলে তাকালো রঙ্গলাল। মণি দাঁড়িয়ে। আপনার টিফিনের বাক্স দাদাবাবু।

রেখে দাও বলে রঙ্গলাল চিঠিখানা আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলো। খানিক পড়ে তার খেয়াল হলো— মণি তখনো দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার ?

আপনার টাকাটা—

মণির হাতে একশো টাকার একতাড়া নোট।

কোন টাকা ?

বাড়ির ট্যাক্স, বাড়ি সারানোর জন্যে দিয়েছিলেন।

এত তাড়াতাড়ি ? কোথায় পেলি ? সবটা এনেছিস ?

সব কথা একসঙ্গে বলতে পারলো না মণি। ওই যে জ্যাকপট বলেন আপনারা—

রেস খেলেছিস ? তোকে আমি রাখবো না মণি।

খেলি না তো।

তবে ?

আন্দাজে টিকিট কেটে খেলেছিলাম। তিনটে ঘোড়া মিলে গেল তাই—

তুই তো ভাগ্যবান মণি। কত পেলি ?

তিয়াত্তর টাকায় ছ হাজার ন শো টাকা।

ওরে বাবা! তাহলে আমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবারে ট্যাক্সি চালাও—

না। তা হবে না। আপনার দেনা দিলাম। বাকি টাকা ডাকঘরে রাখব। সাত বছর পরে—

ততদিনে তে বুড়ো হয়ে যাবি।

হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন। বলে হো হো করে হাসতে লাগলো মণি। বুড়ো হবার অনেক আগেই কিন্তু আপনার সব টাকা ফেরত দিয়ে দিলাম। দেখেছেন—

তা সত্যি।

ডাকঘরে সাত বছরে টাকা ডবল হবে। তখন ভালো দেখে একটা পুরনো ট্যাক্সি কিনবো।

ততদিন কি তোর আর বিয়ের বয়স থাকবে? ঠাট্টা করেই কথাটা বলল রঙ্গলাল। এই সদ্য যুবা কিশোরটি তার কাছে পুরোপুরি বিস্ময়। সারা পৃথিবী যখন হতাশ, অস্থির—তার ড্রাইভার মণি তখন আশাবাদী, স্থির। প্রচণ্ড খাটতে পারে। কখনো না বলে না। ভাগের বাড়ির পুরনো ট্যাক্স ক্লিয়ার করে। ভাঙা বাড়ির ছাদ সারায়। কোনো অভিযোগ নেই।

তার আগেই বিয়ে করে ফেলতে হবে।

নিজের ট্যাক্সি হবার আগেই ?

তা না তো উপায় কি বলুন। আরেকটা ছেলে এসে জুটেছে।

ওল্ড্ ট্র্যাঙ্গেল।

কি বললেন ?

নাঃ। কিছু না।

ছেলেটা একদিন ওকে নিয়ে আবার সিনেমায় যাবার তাল করেছিল।

সে তো একবার শুনেছিলাম।

আবার দাদাবাবু। হাজার হোক গ্র্যাজুয়েট মেয়ে তো। শিক্ষিত ছেলে দেখেছে—ঝুঁকবেই তো।

তা আটকালি কি করে?

রাম প্যাঁদানি।

কাকে? কমলাকে?

পাগল হয়েছেন! এখন গায়ে হাত তোলা যায়? দিলাম ছেলেটাকে ঠ্যাঙানি। আর আমি তো এবারে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছি।

কখন পড়িস?

ভোরবেলা।

তোর গ্র্যাজুয়েট হতে তো বহু দেরি।

তার আগে কমলাকে বিয়ে করে ফেলবো।

ট্যাক্সি কিনবি। বিয়ে করবি। গ্র্যাজুয়েট হবি। এত জিনিস একসঙ্গে পারবি মণি?

দেখবেন আপনি। আমি ঠিক পেরে যাবো।

মণি চলে যেতে ঘর আবার ফাঁকা। বর্ষা চলে গিয়ে আকাশ শীতের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। বাতাসে ফিকে শীত। এই সন্ধ্যেবেলাতেই তেতলার এই ঘরে জানলা দিয়ে শীত আসছিল সন্ধ্যেরাতের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। নিজেই উঠে গিয়ে রঙ্গলাল পাখার স্পিড কমিয়ে দিল।

চেয়ারে বসতে বসতেই তার সুদক্ষিণার কথা মনে পড়লো। ওর লাভারের একটা হিল্লে হয়ে গেলেই ওদের বিয়ের ফুল ফুটবে। হিল্লেটা হচ্ছে না বলে বিয়েটা হচ্ছে না।

ফাঁকা ঘর। রঙ্গলাল প্যাড আর ডটপেন নিয়ে বসে গেল। পৃথিবীতে তার কত কাজ বাকি। খুশির পেটে হুক ওয়ার্ম, টেপ ওয়ার্ম—তুটোই আছে। ওর স্টুল একজামিন করা হয়নি এ মাসে।

পৃথিবীতে যে-কাজ আগে সবচেয়ে সহজ ছিল—এখন তা সবচেয়ে কঠিন। বাঙালী মাত্রেই একসময় একাধিক বিয়ে অবলীলায় করেছে। এখন একটি বিয়ে করতেই তার হিমশিম দশা।

শুধু বৃহত্তর কলকাতার বিশ লক্ষ পরিবারের ভেতর অর্ধেকের বেশি সংসারে এক বা একাধিক বিয়ের কনে বছরের পর বছর বিয়ের দিন গুনে চলেছেন। এর ভেতর শতকরা পাঁচজনও আজকাল কোনো চাকরি পান না।

বিয়ের যোগ্য পাত্ররাও শুধু বয়সেই যোগ্য। জীবিকা তাদের কাছে এখনো হাতছানি। ফলে নতুন করে সংসার পাতার চাকি বেলনি, হাতা-খুন্তির বিক্রিও পড়ে গেছে। একথা কালীঘাটের অন্তত তিনজন বাসন-ওয়ালা আমায় বলেছেন।

কপির ওপরে লিখলো, বিশেষ প্রতিনিধি।

কালকের সকালের কাগজে পাঁচের পাতায় নিচের দিকে পাঁচ কলম হেডিং দিয়ে খবরটা বসাবে। আবার লিখতে লাগলো রঙ্গলাল। কিছু তথ্যের জন্যে এখুনি একবার লাইব্রেরিতে লোক পাঠাতে হবে। আর লাগাতে হবে একজন রিপোর্টার।

পরিবার পরিকল্পনায় অবশ্য বিয়েটা পিছিয়ে দিতে উৎসাহ জোগানো হচ্ছে। কিন্তু বিয়ের ফুল যে অনেকের জীবনেই আর ফুটবে না—তা অরক্ষণীয়ারা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছেন। তাই তাদের ভেতর নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা রীতিমত বেড়ে গিয়েছে। একদিক থেকে এটা সুলক্ষণ। আরেক দিক থেকে পুরুষের বৃত্তির ওপর এর দরুন চাপ পড়ছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দুই-একদিন বাড়ির উল্টোদিকের রকে বসে রঙ্গলাল আড্ডা দেয়। তার বয়সী লোকজন তখন গৃহকর্তা হিসেবে দাঁতের ব্যথায় গারগেল করে। কিংবা গাম্ভীর্য প্র্যাকটিস। ঠিক ঘুমের আগে।

শীত না পড়লেও র‍্যাপার বের করেছে সবাই। সিগারেট ধরিয়ে রকের আড্ডায় বসতেই পাড়ার প্রবীণতম বেকার রাণা বলল, রঙ্গদা, আজ আপনাকে একটা মজার খবর দেব। কোনো ফোন পেয়েছিলেন? দু-এক মাসের ভেতর?

কত ফোন আসে। এটা একটা কথা হলো!

না। মলির ব্যাপারে কোনো ফোন?

হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। কেন বল তো?

আপনি রাগ করবেন না বলুন?

রঙ্গলাল সাবধান হয়ে গেল। কি ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু না। মলি সত্যি ওরকম করছিল। ফোন পেয়ে আপনি ধাতালেন—তখন থেকে মণি এসব বন্ধ করেছে।

কার ফোন? কে করেছিল? একটু হিন্দুস্থানী গলা—

রাণা হো হো করে হেসে উঠল। আমাদের মণি। আপনার ড্রাইভার মণি—ও তার ছোট ভাইকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল।

কেন?

ও সরাসরি বললে—মলি ওকে মারবে। আপনি বকে উঠতে পারেন। তাই ভাইকে দিয়ে ফোন করিয়েছে।

শুনে চুপ করে গেল রঙ্গলাল। মণি তাহলে আমাদের জন্যে এতটা চিন্তা করে। আজকাল তো এরকম ছেলে দেখা যায় না। আশ্চর্য!

রঙ্গলালকে চুপ করে থাকতে দেখে রাণা বলল, প্রভাতের একটা এজেন্সি করে দিন না আমায়। এদিকে অনেক বাড়িতে এখন প্রভাত রাখছে। আপনাদের সাপ্লাই ভালো নয়।

ওসব আমি দেখি নে। তুমি সার্কুলেশনে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে কাগজ নিতে পারো।

আমায় একটু করে দিন রঙ্গলালদা। আমি টাকা পাবো কোথায়?

কাগজ বাড়ছে?

সব বাড়িতে চাইছে। প্রভাতের খুব ডিমাণ্ড এখন। একটা এজেন্সি করে দিন রঙ্গলালদা।

পরদিন বেলাবেলি অফিসে নিজের ঘরে পৌঁছে রঙ্গলাল তো অবাক। পাখা চলছে। তার খালি চেয়ারের মুখোমুখি ভিজিটার্সের চেয়ারে বসে স্বয়ং এম. ডি.। হাতে সকালবেলার প্রভাত।

রঙ্গলালকে দেখে এম. ডি. বললেন, এসো।

আপনি কখন এসেছেন ?

এই তো খানিক আগে। তোমার বিহার ডাকের কাগজের অর্ডার তো বাড়ছে। কি ব্যাপার ?

রঙ্গলাল জানে, এম. ডি. সুখবর ওভাবেই ভাঙেন। একটু একটু করে।

তাকিয়ে আছো কি! বোসো। আমি ম্যাট রেখে দিতে বলেছি ডাকঘর কাগজের। সন্ধ্যে অব্দি ছাপা হবে দরকার হলে।

ডাক ধরাবেন কি.করে ? ট্রেন তো বিকেলে ছাড়ে।

দরকার হলে নাইট প্লেনে কাগজ যাবে।

এম. ডি-র উৎসাহ দেখে রঙ্গলালের ভালোই লাগলো। এই বয়সেও তিনি প্রায়ই বলেন, আমার একখানা বাড়লেও তা সে বাড়লো।

এম. ডি. বলল, গড়িয়াহাট, হাওড়া —সব পয়েণ্টে প্রভাত বাড়ছে। এই তো লক্ষণ। এখন পুরোদমে খবর দিয়ে যেতে হবে।

আমরা যদি একটা পাতা বাড়াতে পারতাম।

এখন বাড়াই কি করে রঙ্গলাল। তার চেয়ে বরং ভালো ভালো রিপোর্ট দাও। তাহলে রিডাররা নেবেন। ভালো লেখাই কাগজকে ভালো করে দেয়। হাওড়ার হকাররা তো আজ এতক্ষণ গেটে বসে ছিল। বললাম, কাল থেকে তোমরা বেশি করে কাগজ পাবে।

বিকেলে ফটোগ্রাফি থেকে একখানা ছবি এলো। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার ছ মাস পর নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম প্রেস কনফারেন্স। কাল অন্য সব কাগজে ছবি বেরোবে—মুখ্যমন্ত্রীর মুখের সামনে একটি মাইক। ফটোগ্রাফারকে বলা ছিল রঙ্গলালের। মুখ্যমন্ত্রীর পেছন থেকে ছবি তোলা হয়েছে। ধুতি পাঞ্জাবি-পরা মুখ্যমন্ত্রী একঘেয়ে জুতো পায় দিয়ে থাকতে থাকতে পায়ের পাম্পসু কার্পেটের ওপর খুলে রেখেছেন। রীতিমত একজন ঘরোয়া বাঙালীকে সাইড থেকে লেনসে ধরা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সামনে প্রেসের লোক। মুখ্যমন্ত্রীর দু পাশে দুই মন্ত্রী। শ্রমমন্ত্রী আর অর্থমন্ত্রী। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কোনোটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনোটার সিধে জবাব মিলেছে।

একটি প্রশ্নে চোখ আটকে গেল রঙ্গলালের।

একথা কি সত্যি যে, বিড়লা এ রাজ্যে একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করবেন?

মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, টাকার অঙ্ক বলা যাচ্ছে না। তবে বিড়লা লগ্নী করবেন।

আপনাদের ভেতর কোনো কথা হয়েছে?

সবকিছুই এখন প্রাথমিক স্তরে।

রঙ্গলাল ওই ছবির কোনো ক্যাপশন না দিয়ে ছবির নিচে হেডিং বসালো—

বিড়লা বড় করে
লগ্নী করবেন

হেডিংয়ের নিচেই খবরের চুম্বকটুকু বসিয়ে দিয়ে টানা প্রশ্নোত্তর জুড়ে দিল রঙ্গলাল। কালকের কাগজের পয়লা খবর। অবিশ্যি অন্য কাগজও দেবে। কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করছে কে কেমন হেডিং করে তার ওপর।

খুশি সকালবেলা বেড়াতে যাবে বলে ললি মলিকে বিছানা থেকে তুলবার চেষ্টা করলো। ওরা দুজন উঠলো না। স্রেফ পাশ ফিরে শুয়ে থাকলো। খুশি তবু তার সামনের একখানা পা মানুষদের মত হাত বানিয়ে ললিকে ঠ্যালা দিতে লাগলো। যদি মেয়েটা ওঠে। যদি তাকে নিয়ে ভোরবেলায় রাস্তায় বেড়াতে বেরোয়।

দিদিদের ঘর থেকে বেরিয়ে এ বাড়ির সবচেয়ে লম্বা মানুষ রঙ্গলালের সঙ্গে দেখা হলো খুশির। এই লম্বা লোকটা আগে তাকে আদর করতো। আজকাল একদম কাছে আসে না। ব্যাপার কি? সব সময় অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। খুশি এক ফাঁকে জিভ দিয়ে একটু চেটে

দিল। লোকটা হাত সরিয়ে নিয়ে তার মাথায় রাখলো। তারপর যেন কি বলতে লাগলো তাকে।

রঙ্গলাল তখন খুশিকে বলছিল, কেমন আছিস ?

খুশি বলতে চাইলো, তুমি আর আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোও না কেন ?

রঙ্গলাল শুনতে পেলো, ঘোউ। ঘো-ও-ঔ।

তখন রঙ্গলাল বললো, আজ ইস্টার্ন কেনেল ক্লাবে ডগ শো আছে। যাবি ?

খুশি খুব জোরে তার লেজ মোচড়াতে লাগলো।

রঙ্গলাল ওকে আর বেশি সময় দিতে পারলো না। বিয়ের ফুল ফুটতে দেরি—হেডিং দিয়ে সুদক্ষিণার কেসটা সাজিয়ে লিখে দিয়ে রঙ্গলাল সেদিনকার সকালের প্রভাতকে টক অব দি টাউন করে তুলতে পেরেছিল। পরে মনে হয়েছে তার—হেডিং হওয়া উচিত ছিল—অরক্ষণীয়া।

এবার তার ইচ্ছে—সে মণির জীবনী লিখবে। তার গাড়ির ড্রাইভার মণি। তার জন্ম। তার গাঁজাখোর বাবা। তাদের তিন ভাই মিলে গ্র্যাণ্ডের সামনে গাড়ি ধোয়ামোছা করা। সেখানে ড্রাইভিং শিখবার জন্যে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের খিদমতগিরি। কানে কম শুনেও সে কেমন স্পীডে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালায়। তার প্রেম। গ্র্যাজুয়েট হবার জন্যে এই বয়সে সে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে চলেছে। সে জন্যে প্রাইভেট টিউটর রেখেছে। ভোরে উঠে পড়তে বসে। একদিন সে তার নিজের ট্যাক্সি চালাবে। বিয়ে করবে।

এ স্টোরি কোনো কাগজ দিতে পারবে না।

সাধারণ মানুষের কাহিনী। সাধারণভাবে লিখতে হবে। ধারাবাহিক বেরোবে। সপ্তাহে বুধবারের কাগজ পানসে হয়ে যায়। ফি বুধবার বেরোবে। হেডিংটা কি করা যায় ?

মণি ড্রাইভারের কাহিনী। পছন্দ হলো না রঙ্গলালের।

বসার ঘরের ছোট টেবিলটায় বসে লিখতে লাগলো। হেডিংগুলো। লিখতে লিখতে যেটা মনে ধরবে—সেটার লেটারিং করিয়ে নেবে আর্টিস্টকে দিয়ে। সঙ্গে একজন কাল্পনিক তরুণের মুখচ্ছবি দিতে হবে লাইন ড্রইংয়ে। আর চাই গ্র্যাজুয়েট মেয়েটির ছবি। সরল ইলাস্ট্রেশন। একখানা ভাঙা ট্যাক্সির ছবি। বাস।

একটি তরুণ অঙ্কুর। নামটা কেমন? কিংবা এ নামটা কেমন?—নিজের ট্যাক্সি।

মনে মনে রঙ্গলাল কয়েকবার আউড়ে নিল। নিজের ট্যাক্সি। নিজের ট্যাক্সি।

পুরো জিনিসটা মনে মনে এঁকে নিতে লাগলো সে। চার কলম জুড়ে চারের পাতায় অনেকটা শাদা রেখে একটা ভাঙা ট্যাক্সির ছবি দিতে হবে। কলমের মাঝামাঝি আশাবাদী মণির মুখচ্ছবি। সাত আট কিস্তিতে লেখাটা শেষ করতে হবে।

একদম জীবন থেকে তুলে নেওয়া এ কাহিনী পাঠকরা গোগ্রাসে গিলবে। এবার সে নিজের নামেই লিখবে। বিশেষ প্রতিনিধি কথাটা যেন কেমন পর পর। তার কোনো শরীর নেই।

এখন সকালবেলা বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু সে আর খুশি এ বাড়িতে সবচেয়ে আগে ঘুম থেকে ওঠে। রুবি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুদক্ষিণা বোধহয় মর্নিং স্কুলের জন্যে তৈরি হচ্ছে। কিংবা একটু পরে হয়তো হবে।

রোজ সকালবেলা খানিকটা টাটকা জীবন নিয়েই তো খবরের কাগজ। সেই টাটকা জীবনকে দৈনিক প্রভাত তুলে ধরতে চায়। সেজন্যে চাই ফ্রেস লেখা। একদম আনকোরা মনের টগবগে লেখা পেতে হলে নতুন মানুষ চাই। চাই এমন মানুষ—যার দেখবার চোখ আছে। সে লেখা সারা কাগজে একটি থাকলেই যথেষ্ট। পাঠক খুঁজে নিয়ে পড়বে। এমন লেখা পাওয়া সবচেয়ে কঠিন।

পার্ক স্ট্রীট আর ট্রাম লাইনের ক্রসিংয়ের কাছাকাছি পাতাল রেল

ময়দান খুঁড়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারই গায়ে কেনেল ক্লাব। কিন্তু সেখানে ডগ শো হচ্ছে না। হচ্ছে—সেণ্ট পল ক্যাথিড্রাল আর প্যারিস হলের মাঠে। কাছাকাছি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম।

বাইরে গেটে প্রচণ্ড ভিড়।

এম. ডি. রঙ্গলালকে পই পই করে বলেছেন, তোমার ওপর নির্ভর করছি আমি। তুমি ডগ শোতে যাবে। গিয়ে প্রাইম মিনিস্টারের মেয়ের বান্ধবীর কুকুরের ছবি তোলাবে। ওদের সঙ্গে কথা বলবে। তারপর কালকের টাউনের কাগজে সে স্টোরি যাতে যায়—তাই দেখবে। এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে।

এম. ডি. যখন বলেন—প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে—তখন, তার মানে অনেকখানি। রঙ্গলালের জন্মের আগে এম. ডি. তার যৌবন বয়সে এ-প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিজ্ঞাপন এনেছেন। ঘুরে ঘুরে। কঠিন সময়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন। ঝুঁকি নিয়ে খবর করেছেন এক সময়। ওঁর কথার মানে আলাদা।

মুখ্যমন্ত্রী দূর থেকে রঙ্গলালকে দেখে একটু হাসলেন। রাজ্যপালের স্ত্রী বসেছেন—একখানা সিংহাসন মার্কা চেয়ারে। মাথার ওপরে বড় রঙীন সামিয়ানা।

প্রথমে ক্লাবের ফ্ল্যাগ তোলা হলো আকাশে। তখনই ক্লাবের এক পাণ্ডাকে ধরে রঙ্গলাল জেনে নিল—মেজর জেনারেল রানধাওয়ার স্ত্রী ওই মহিলাদের ভেতর কে?

শীতের এই সকালে—বেলা ন'টা হবে—বেগুনী শাড়িতে মেয়েটিকে ভালোই দেখাচ্ছিল।

স্টেটসম্যানের সুব্রত পত্রনবীশ এই ঝকঝকে গ্যাদারিংয়ের রঙীন ছবি তুলেছিল। তারই পাশে প্রভাতের ফটোগ্রাফার। মেয়েটি বা মহিলা—বছর তিরিশেক বয়স হবে—প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের ক্লাসফ্রেণ্ড—লেনসের রেঞ্জের ভেতর নিস্পৃহ হাসি হাসছিল। কোলের কাছে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটি গ্রেট ডেন। এ কুকুর কে না চেনে।

ছোটখাটো একটি বাছুর প্রায়। গলায় রূপোলি চেন। কালো কাজল-টানা চোখ। ছাই রঙের ঝোলা কান। চোখের মণিতে সাধক ভঙ্গী। কোন্‌দিকে তাকায়? কি চায়? বোঝা যায় না।

এরকম অনেকে সঙ্গে নিয়ে বসে আছে।

সব কুকুরের নাম জানে না রঙ্গলাল। জানাও সম্ভব নয়। কয়েকটা কুকুর মাঝে মাঝে ডাকছে। নানা রকমের কণ্ঠস্বর।

গেটের [illegible]ইরেও ভিড়। নানা রঙের গাড়ি। তাদের ড্রাইভাররা। রাস্তার লোক। সি. এম. ডি. এ-র গাড়ি। উপরন্তু ভবানীপুর খিদিরপুর এরিয়া থেকে কি করে খবর পেয়ে রাস্তার কিছু ঘিয়ে ভাজা দিশী কুকুর এসে হাজির হয়েছে। এখানে ঢুকবার আগে তাদের বিচক্ষণ, বিজ্ঞ হাঁটাচলা কারও চোখ এড়াবার নয়।

প্রভাতের ফটোগ্রাফার মিসেস রানধাওয়ার সঙ্গে রঙ্গলালকে আলাপ করিয়ে দিল।

রঙ্গলাল একটু একটু করে আলাপ জমাতে লাগলো। গ্রেট ডেনটির বয়স। তার মা বাবা কে ছিলো। এদের আদি নিবাস।

একটু আগে রঙ্গলাল সুভেনিরে পড়ে নিয়েছে। গ্রেট ডেন—নামের পাশে লেখা আছে—এ বিগ, পাওয়ারফুল, ওয়েল বিল্ট, স্মুদ—কোটেড ডগ্‌ উইথ ডিস্টিঙ্গুইসড রেক্‌টাঙ্গুলার—সেপড্‌ হেড্‌, স্মল ইয়ার্স অ্যাণ্ড লং টেইল।

সুভেনিরের একত্রিশ পাতায় আরেকবার তাকালো রঙ্গলাল।

মিনিমাম হাইট ফর গ্রেট ডেন থার্টি ইঞ্চেস, দি টলার দি বেটার। এ হাইলি ইনটেলিজেন্ট হাউস ডগ অ্যাণ্ড কম্পানিয়ন। ইট ইজ নট এ ডগ টু বি কেপ্ট ইন এ স্মল হাউস অর বাই এনি ওয়ান উইথ অ্যান এম্পটি পার্স।

মিসেস রানধাওয়া জানতে চাইলো, কুকুর সমেত তার যে ছবি তোলা হলো—তা কি ছাপা হবে?

নিশ্চয়। কাল সকালের কাগজেই দেখতে পাবেন।

-আমি তো বাংলা পড়তে পারি নে।

আমাদের ইংরেজি কাগজেও ছাপা হবে।

কি কাগজ?

রঙ্গলাল নাম বলতেই মিসেস রানধাওয়া চেঁচিয়ে বলে উঠলো, দিল্লি থাকতে আমার বাবা কিনতেন। ক্যাপিটাল এডিশন। আমার বিয়ের আগে।

কথায় কথায় ঠিক হলো—আসছে 'আমি বলে' রঙ্গলাল সস্ত্রীক যাচ্ছে। গালা ডিনার। দেখবার জিনিস। অনেক কিছু। মিলিটারী টাট্টু। ছুটন্ত মোটর সাইকেলে দাঁড়ানো চালক। বাজি পোড়ানো হবে রাতে। ইডেনে। নেমন্তন্নটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিল রঙ্গলাল। মিসেস রানধাওয়া পার্স বের করে তার ভেতর থেকে ছোট ডাইরিটে রঙ্গলালের ফোন নাম্বার লিখে নিল।

রঙ্গলাল তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আগামীকালই জেনারেলকে নেমন্তন্ন জানাতে যাচ্ছে ফোর্টে—একথা বলে রাখলো।

মিসেস রানধাওয়া বললেন, বেশ তো, কাল বিকেল চারটেয় আসুন। একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। জানেনই তো জেনারেল খুব ব্যস্ত থাকেন। আশা করি ওঁকে আমি আপনার জন্যে হাজির রাখতে পারবো।

সুভেনির জুড়ে নানা কুকুরের ছবি। পরিচিতি। মালিকদের নাম। বংশতালিকা।

বিড়লারা এ অনুষ্ঠানের জন্যে চাঁদা দিয়েছেন। সেজন্যে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ঈশান কেমিক্যালস্ সারা মাঠ রোগ-বীজাণু মুক্ত করে দিয়েছে বলে তাদেরও ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ এইসব কুকুরদের —যাদের সহযোগিতা ছাড়া এ অনুষ্ঠান হতে পারতো না।

কর্মকর্তাদের নামের তালিকায় অনারারি সেক্রেটারির নাম দেখে রঙ্গলালের চোখ আটকে গেল। মিস্টার জগৎ বসু।

এ নাম সে যেন কোথায় পেয়েছে। মনে আসছে না। খুশি এখানে

এলে গোলমাল করে দিত। একটি লেখায় এসে চোখ আটকে গেল রঙ্গলালের।

হাউ টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড এনজয় এ ডগ শো।

লিখেছেন—জগৎ বসু।

সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক প্রভাতের দফতরে পাঠানো সেই চিঠিখানার কথা মনে পড়লো রঙ্গলালের। এঁর চিঠি দিয়েই সে পয়লা পাতার খবর করেছিল।

ডগ শো বুঝে কি করে আনন্দ পেতে হয়।

ইফ ইউ আর অ্যাটেনডিং এ ডগ শো ফর দি ফার্স্ট টাইম ইউ উইল বি ফ্যাসিনেটেড উইথ এ গ্রেট নামবার অ্যাণ্ড ভ্যারাইটিজ অব ডগস্ ইউ উইল সি। হোয়ার ইউ উইল সি এ নামবার অব ডগস্ বিয়িং পোজড্, প্যারেডেড্ আপ অ্যাণ্ড ডাউন বাই ইনটেন্স হ্যাণ্ডলার্স, চেকড্ ফ্রন্ট অ্যাণ্ড ব্যাক ইনডিভিজুয়ালি দেন ওয়ান এগেইনস্ট দি আদার বাই এ সিরিয়াস পারসন হু ইজ দি জাজ।

এই লেখককে রঙ্গলাল চেনে। ইনি প্রতিবেশী প্রাণীর সঙ্গে কলকাতাকে কি করে মিশতে হবে তাই শেখাচ্ছেন। কলকাতাকে সভ্য করে তুলছেন। খুশি কি তাহলে ললি মলির সঙ্গে এঁর কাছেই যায়?

দি জাজ ট্রাইজ টু পিক দোজ ডগস হুইচ আর নিয়ারেস্ট টু আইডিয়াল টাইপ অ্যাণ্ড হুইচ আর সাউণ্ড বোথ ফিজিক্যালি অ্যাণ্ড মেণ্টালি।

মিসেস রানধাওয়ার সঙ্গে তার সেই বাছুর-মার্কা কুকুরটা এখন জজের সামনে হাঁটছে। দি পিকিং গিজ ইজ এ ফেবারিট পেট ডগ দ্যাট কামস ফ্রম চায়না।

আরেক জায়গায় লেখা—টিবেটান স্প্যানিয়েল।

এ ফিউ অব দিজ ডগস ফ্রম দি টিবেটান মানাসট্রিস হ্যাভ রিচড ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড আমেরিকা বাই ওয়ে অব ইণ্ডিয়া। এ লাইভলি অ্যালার্ট হাউস ডগ—রিজার্ভড উইথ স্ট্রেঞ্জার্স।

বকসারের পাশে লেখা—এ পাওয়ারফুল—ইয়েট কাইণ্ড অ্যাণ্ড জেণ্টেল ডগ। অ্যাল্‌ফ উইথ স্ট্রেঞ্জার্স। একসেলেণ্ট পেট ফর চিলড্রেন।

পড়তে বেশ লাগছিল। চারদিকে ভিড়। নানা জাতের কুকুর তাদের প্রভুদের সঙ্গে জজের সামনে প্যারেড করছে। তাদের নানা গলায় ডাক। গেটের বাইরে দিশী কুকুরদেরও আহ্লাদ হয়েছে। তারাও চেঁচাচ্ছে।

এই অবস্থায় অল্প কথায় কুকুর-চরিত জানতে কার না ভালো লাগে।

অ্যালসেসিয়ানের পাশে লেখা—এ গাইড ডগ ফর দি ব্লাইণ্ড।

আফগান হাউণ্ড—ইন হিজ হোমল্যাণ্ড দি আফগান ইজ এ রিয়াল ইউটিলিটি ডগ—গার্ডিং দি টেণ্ট অর ক্যারাভান, বাই নাইট অ্যাণ্ড হাণ্টিং দি গ্যাজেল অ্যাণ্ড ডেজার্ট ফক্স বাই ডে। ইন ইণ্ডিয়া হি ইজ আণ্টায়ারিং ইনটেণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রোটেকটিং দি ফ্লক্স অব সিপ।

তুই এখানে কি করছিস?

চোখ তুলে তাকালো রঙ্গলাল। কলেজ-জীবনের ক্লাসফ্রেণ্ড—টুনু। টুনু দত্ত। তুই এখানে?

আমি তো কেনেল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। তোর কুকুর কোথায়?

আমি এসেছি রিপোর্ট নিতে। তুই তোর কারখানা ছেড়ে এখানে?

সেই কাগজে আছিস এখনো? ভালো। আমার কথা বলিস না। টেনশন কেটে যায় এ ক্লাবে এলে। ছুটো অয়ারহাউস লকআউট করে দিতে হলো এ মাসে।

বিয়ে করেছিস?

না রে। করা হয়নি। খোঁজে আছে তোর?

আমি কোথায় পাবো! এখানে ছাখ্, না কেউ—

সে জন্যেই তো সকাল থেকে এখানে আছি। যদি কারো সঙ্গে ইন্টিম্যাসি হয়ে যায়—। তাছাড়া—

তাছাড়া কি ভাই ?

এই জগৎটার জন্যে আছি। আনারারি সেক্রেটারি। আমি যখন বিলেতে—ও তখন রয়েল কলেজে পেট অ্যানিমালের ওপর কাজ করছিল। সেই থেকে আলাপ।

টুনু দত্তর হাতের নির্দেশে জগৎ বসুকে চিনতে পারলো রঙ্গলাল। মোটাসোটা। কালো স্যুট; লাল টাই। দারুণ পার্সোনালিটি। শুধু নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে লোকটার। এরই লেখা একটু আগে সুভেনিরে পড়েছে রঙ্গলাল। হাউ টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড এনজয় এ ডগ শো।

কোথায় আছিস ?

রাস্তার নাম বললো রঙ্গলাল।

আমি তো ওর পেছনেই থাকি। ফিফটি থ্রি বাই এ। সেকেণ্ড ফ্লোরে। তোর নম্বর ?

টুয়েলভ বি—

রঙ্গলালের কথা শেষ হবার আগেই টুনু দত্ত একজন মহিলাকে পিছন থেকে ডাকলো—হে ! ক্যাথে—

মহিলার নাম বোধহয় ক্যাথে—। ভারতীয়। তবে একটু টেস্যু ভাব আছে।

ঠিক এই সময় গেটে একটি ট্যাক্সি এসে থামলো। তার ভেতর থেকে গলায় চেন বাঁধা খুশিকে নিয়ে মলি ললি বেরিয়ে এল। ভাড়া মিটিয়ে ওরা যখন গেটে প্রায় ঢুকে পড়েছে—ঠিক তখনই একজন গার্ড মত লোক, মাথার টুপির স্ট্র্যাপ চিবুকে আটকানো—সিদে এগিয়ে এসে ওদের তিনজনকে প্রায় ঠেলে বের করে দিল।

একগাদা রাস্তার লোক, দিশী কুকুরের ভিড়। তাদের সামনে এমন অপমানও ওদের কাবু করতে পারলো না।

মলি নেপালী দরোয়ানকে বলল, ওই তো আমাদের বাবা বসে আছে। ওই যে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে—

দরোয়ান বলল, এখোন কাউকে ডাকতে পারবো না। যাও দিদি—

বাঃ। আমাদের বাবা! ডেকে দেবে না কেন?

খুশিও রঙ্গলালকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। মলি জোরে ডাক দিল। বন্ধ গেটের ওপর গলা তুলে। বাবা! এই বাবা—

রঙ্গলাল এই সময় মিসেস রানধাওয়ার সঙ্গে কথা বলছিল।

ললি দেখলো, মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সাজাগোজা একজন মহিলার সঙ্গে বাবা দিব্যি জমিয়ে গল্প করে যাচ্ছে। তবু গলা তুলে ডাকলো। বাবা, ও বাবা—আমরা খুশিকে নিয়ে এসেছি। একটু গেটটা খুলতে বল তুমি।

অতগুলো কুকুরের কোরাসের ভেতর ললির গলা রঙ্গলাল অব্দি পৌঁছনো সম্ভব নয়।

মলি বলল, তখনই বলেছিলাম—বাবার কার্ডখানা চুরি করে রেখে দে—

ললি বলল, সময়-টময় টুকে রেখেছিলাম। কার্ড না হলে তো বাবা ঢুকতেই পারতো না।

বাবা ঘাঘু আছে। সবাই চেনে। বাবার কোনো কার্ড লাগতো না। চল্ ললি—আমরা মাঠের ওদিকটা দিয়ে ঢুকতে পারি কিনা দেখি। ওখানে পাহারা নেই। কাঁটাগাছের পাশ দিয়ে ফাঁকও রয়েছে।

৯

বড়লোকের বাড়ির কেচ্ছা একসময় কাগজে ছাপা হতো। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা একসময় বহু কাগজকে বাঁচিয়েছে। সেরকমভাবে না দিয়ে—বরং খানিকটা তথ্য প্লাস খানিকটা মজা জুড়ে দিয়ে ডগ শোর কপি ছাপা হলো দৈনিক প্রভাতে।

মিসেস রানধাওয়ার ছবি। তার সঙ্গে ভাবুক গ্রেট ডেনের হেড স্টাডি। তার পাশে একটি আদুরে পুডল। তিনখানি ছবি মিলিয়ে একটি তিন কলমের স্ট্রিপ। তার গায়ে একখানি ডবল কলম ছবি। গেটের বাইরে দাঁড়ানো ভবানীপুর, খিদিরপুরের দিশী কুকুরদের জটলা। নিচে ক্যাপশন—গেটের বাইরে।

মিসেস রানধাওয়ার ক্লাসফ্রেণ্ড প্রধান মন্ত্রীর মেয়ে। এম. ডি. চান—দৈনিক প্রভাত বাংলা কাগজ হয়েও প্রধান মন্ত্রীর বাড়িতে খাবার টেবিলে আলোচনায় উঠুক।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একশো গজও যায়নি গাড়ি। মণি পাশ কাটাতে গিয়ে এক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে বসলো। বয়স্কা। বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছিল। কি মুশকিল। সবাই গাড়ি ঘিরে ফেলল। রঙ্গলাল গাড়ি থেকে নেমে বলল, ভিড় করবেন না। আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

সঙ্গের বাচ্চাদের দিয়ে কাছেই বাড়িতে খবর দিয়ে মহিলাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেল রঙ্গলাল। কোমরের নেফেয়ার বোন ভেঙে গেছে।

অফিসেও তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। অথচ যাবার উপায় নেই। মহিলার আত্মীয়স্বজন এসে গেলেন।

এমারজেন্সির দুর্দশা দেখে রঙ্গলাল ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। দুজন তরুণ ডাক্তার। একজন নার্স। আর দুজন অ্যাটেনডেন্ট। কাজের চাপ প্রচণ্ড। ডাক্তাররা প্রায় দিশেহারা। অ্যাক্সিডেন্ট, আগুন, আত্মঘাতীর কেসে ঘর বোঝাই।

মহিলার এক্সরে করিয়ে ডাক্তার ভর্তি করে নিলেন। কেস লিখিয়ে ডাক্তার বললেন, লোকাল থানায় গিয়ে সব বলুন।

টেলিফোনে রুবিকে সব জানিয়ে রঙ্গলাল থানায় গেল। তারা বলল, লালবাজার ট্রাফিকের ও-সি ফ্যাটল স্কোয়াডের সঙ্গে কথা বলুন।

সন্ধ্যের দিকে ছ' বোতল স্যালাইন কিনে দিয়ে রঙ্গলাল যখন অফিসে পৌঁছলো তখন ধোঁয়া মাথানো শীত সন্ধ্যার কলকাতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

নিজের অফিসঘরে ঢুকে রঙ্গলাল দুখানা হাত টেবিলে ভাঁজ করে মাথা নামিয়ে দিল। কোথায় সময়মত বোর্ডের মিটিংয়ে আসবে—তা নয়—হাসপাতালেই কেটে গেল সারাটা দুপুর আর বিকেল। ডাক্তার তো বলেছেন ফ্যাটল কিছু হবে না। তবে প্লাস্টার করতে হবে। তার জন্যে একজন মহিলা হয়তো বাকি জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। ভাবতেই কেমন বিশ্রী লাগে। মণি সেই থেকে চুপ করে আছে।

মণিরই বা দোষ কিসের। এরকম তো হতেই পারে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রঙ্গলাল। মাথায় কি লাগতে জেগে গেল। বেশ বিরক্ত হয়েই মাথা তুললো। এ অফিসে তার মাথায় হাত দেবে—এমন বাচাল—গায়ে-পড়া মানুষ কে থাকতে পারে।

উঠে বসে সামনে যেন ভূত দেখেই উঠে দাঁড়ালো রঙ্গলাল।

স্বয়ং এম. ডি. দাঁড়িয়ে। খুব ক্লান্ত? আজ মিটিংয়ে আসোনি কেন?

গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল।

কেউ মারা যায়নি তো?

না।

ঠিক আছে। বলেই এম· ডি. দাঁড়ানো অবস্থাতেই, রঙ্গলালের টেবিলে দু আঙুলে তাল ঠুকে মিঠে গলায় টপ্পার একটি বোল তুললেন। নিজেই গান থামিয়ে এম. ডি. বললেন, আজ টাউনে বেড়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার। মফস্বলের খবর এখনো আসেনি।

তাই নাকি?

সার্কুলেশন হিমসিম খাচ্ছে। এত কাগজ তো আগে বেচেনি কখনো। তোমার ওই কুকুরদের ছবি আর হেডিং খুব ধরেছে—

একখানা পাতা যদি বাড়িয়ে দেওয়া যেত।

দিলে ভালো হতো। কিন্তু কাগজ বাবদে খরচ তো জানো। তার চেয়ে চোখা রিপোর্ট দিয়ে যাও। তোমার বুদ্ধির মতো। তাহলেই ওদের অবস্থা এক্সপোজ্‌ হয়ে যাবে।

ওদের মানে—আরেকখানা দৈনিক। প্রায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতই আরেকটা টিম।

এম· ডি. চলে গেলেন। অনেকদিন পরে লম্বা ক্লান্তির ওপর সার্কু-লেশনের খবরটা ঠাণ্ডা বাতাস হয়ে বয়ে গেল।

টেলিফোনে একটা লাইন চাইতেই অপারেটর বলল, একটা বাইরের লাইন আছে আপনার।

হ্যালো?

রঙ্গলাল সেন আছেন?

বলছি।

আমি সুদক্ষিণা।

কি মনে করে? ভালো তো?

সব ভালো। আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

পুরুষ না মেয়ে?

সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ি না ফিরুন—রাত ন'টার ভেতর তো ফিরবেন। বিজু আপনার খুব ফ্যান। বিজলি মজুমদার। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত। এখন রেলের পাবলিক রিলেসনে আছে।

নিজে রিফিউজ করে এখন অন্য কারও হাতে আমাকে গছাতে চাইছো।

কে বলেছে? আমি ফোন রাখছি। আসবেন কিন্তু।

রাত আটটার ভেতর বাড়ি ফিরে শোবার ঘরে ঢুকল রঙ্গলাল। রুবি ওদের নিয়ে বসবার ঘরে বসে আছে। সেখানে মলি ললিও হাজির। সমানে আড্ডা দিচ্ছে। খুশি এই শীতের রাতে রুবির একটা পুরনো ব্লাউজ গায়ে দিয়ে কুন্তির সঙ্গে রকে বসে পাড়ার ঝিদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল।

থানায় ফোন করে জানলো টেস্টের জন্যে গাড়ি কাল দুপুরেই লালবাজার ট্রাফিকে পাঠিয়ে দেবে।

তারপর এ ঘরে এসে বসতেই বিজলি হাত তুলে নমস্কার করল। সুদক্ষিণা বলল, ওর জন্যে আপনি একটি পাত্র দেখে দেবেন।

আমি কি ঘটক নাকি?

তা নয়। আপনার কাছে অনেকেই তো আসে।

আগে আলাপ হোক। আপনিই সুদক্ষিণার বিজু?

হ্যাঁ। মলির কাছে শোনেননি আমার নাম?

শুনেছি বোধহয়। আপনি তো ভালো থিয়েটার করেন।

রুবি বলল, খুব ভালো। মলির মুখে শুনেছি।

এমন সময় দরজায় বেল বেজে উঠল।

কুন্তি খুশিকে কোলের ছেলের কায়দায় পিঠে তুলে এসে হাজির। দাদাবাবু! কে তোমায় ডাকছে।

ডেকে নিয়ে এসো ভেতরে।

বলতে না বলতে টুনু এসে হাজির। টুনু দত্ত। যার অয়ারহাউসে এখন লক আউট। কারখানা বন্ধ। ডগশোর দিন ক্যাথিড্রালের মাঠে দেখা হয়েছিল।

বৌঠান কোন্‌জন? বলে দে রঙ্গলাল—

কেন? চিনে নে—

রুবি হেসে উঠে দাঁড়াল। নমস্কার করে বসতে বলল।

বিবাহিতা-অবিবাহিতা চিনতে পারিস নে?

কি করে চিনবো? তোর মত বিয়ে হয়েছে আমার?

এতদিন বিয়ে করিসনি কেন?

মলির সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষিণাও হেসে উঠল। খুশি এসে এক ফাঁকে টুনুকে শুঁকে গেল।

টুনু বলল, সময় পাইনি। সকালে উঠে কারখানা যাই। সন্ধ্যেবেলা চান করে ক্লাবে যাই। ব্যস।

তাহলে বাকি জীবন তাই করে যা। আর বিয়ে করে করবি কি।

না রে। এবার বিয়ে করতেই হবে। তোদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। পাত্রী চাই।

বয়স কত লিখেছিলি।

যা তাই।

তবু?

চল্লিশ।

এখনও চল্লিশ তোর টুনু? আমারই তো চুয়াল্লিশ।

বলুন বৌঠান। আমাকে পঁয়ত্রিশের বেশি দেখায়?

রুবি বলল, না না।

তবে? বলেই টুনু রঙ্গলালকে বলল, আমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দে না।

পাত্রী আছে হাতে। চাকরি করে। গ্র্যাজুয়েট। এই তো সামনে দাঁড়িয়ে।

বিজলি মজুমদার লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। না না। আমি না। আমি যাই।

সুদক্ষিণা ধরে রাখল। বোস না বিজু।

রঙ্গলাল বলতে লাগল, পাত্র ভালো। বছরে এক লক্ষ টাকার ওপর আয়। বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার।

বিজু বলল, আমি উঠি।

টুনু বলল, আপনি উঠবেন কেন? আমি তো হঠাৎ এসেছি। আমি যাচ্ছি। আপনার গার্জেনদের বলবেন—কুষ্ঠি আর একখানা ফটো আমার বাবাকে দিয়ে যেতে। রঙ্গ আমার ঠিকানা জানে।

না রে। আমি ঠিকানা পাব কোথায়?

গাইডে পাবি। দত্ত কনসালট্যান্টস।

উত্তর দিক থেকে লরিগুলো নর্থ ক্যালকাটার ব্রিজে ওঠে। ট্রাফিক পুলিস যেখানটায় দাড়িয়ে থাকে তার পাঁচ গজ দূরে ফটোগ্রাফারের সঙ্গে রঙ্গলাল দাঁড়িয়েছিল। শীতকালের বিকেলবেলা। একটা বছর বারোর ছেলে লরিতে উঠে গেল। লরিটা থামল। পয়সা নিয়ে ছেলেটা ট্রাফিকের কাছে গেল।

পর পর চারটে এক্সপোজারে ছবি নিল দৈনিক প্রভাতের ফটোগ্রাফার চণ্ডী। ওই নামেই সবাই চেনে তাকে।

রঙ্গলাল বলল, গুটিগুটি হেঁটে এবার ডার্করুমে চলে যাও।

ট্রাফিকের পাশ থেকে সেই ছোট ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, ফটো খিচা রে—

সঙ্গে সঙ্গে লরির লোকজন, ব্রিজের নিচের পানওয়ালার লোক হই হই করে ছুটে এল। চণ্ডী ততক্ষণে পগার পার।

পায়ে পাম্পসু। পঁচাশি কেজির রঙ্গলাল ধরা পড়ে গেল। এক সেকেণ্ডের ভেতরেই সে দেখতে পেল মাথার ওপরের ব্রিজটা কাৎ হয়ে নিচের রেল লাইনে পড়ে যাচ্ছে।

অফিস যাবার সময় রঙ্গলাল রুবিকে বলে গিয়েছিল, ফিরতে আমার রাত হতে পারে। তুমি একবার হাসপাতালে যেও।

রুবি তাই কোনো খবরই পেল না রঙ্গলালের। হাসপাতালে গিয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। মহিলার প্ল্যাস্টার হবে আবারও। কিছুটা হয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনরা খরচের ফিরিস্তি দিচ্ছিল। বয়স্ক এক ভদ্রলোককে দেখে রুবি রঙ্গলালের দেওয়া একখানা একশো টাকার নোট

হাতে দিল। আমি তো সব জানি না। এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন মলির বাবা—

বাড়ি ফিরে দেখলো, মলি আবার চারতলায়। ললি খুশিকে নিয়ে লাল বারান্দায় খেলছিল। কুন্তিকে দিয়ে মলিকে ডেকে পাঠাল রুবি।

তর তর করে নেমে এসেই মলি বলল, ডাকছো কেন মা ?

সব সময় বড়দের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া কেন ? আর ক'দিন বাদে টেস্ট পরীক্ষা। বই নিয়ে পড়তে বসো।

আমি আর এখন পড়ব না মা। বিজুদির ফটো পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবার সেই বন্ধু—তাঁর বাবাকে। ভদ্রলোক খুব অসুস্থ—সুদক্ষিণাদি বলছিল। টুনুবাবুর বিয়েটা দিয়ে তবে মরতে চান।

তোর এত খবরের দরকার কি ? তুই তো পাস করবি না !

তাতে কি। আমি হিরোইন হব মা।

কত সোজা। তার জন্যে খাটাখাটুনি দরকার। স্বাস্থ্য চাই। বিদ্যে-বুদ্ধি চাই।

কেন ? জয়া ভাদুড়ি কতদূর পড়েছে ?

সে আমি জানব কি করে ! দ্যাখ্ তো—তোদের হেমমালিনী কত সুন্দর নাচে !

আমিও গুরুজীর কাছে নাচ শিখছি। হেমাকে আউট করে ধর্মেন্দ্রর হিরোইন হবো আমি।

ওমা ! সে কি কথা ! ধর্মেন্দ্র তোর বাপের বয়সী !

সিনেমায় কোনো বাবা নেই মা। সিনেমায় শুধু হিরো-হিরোইন। আর সব এলেবেলে ! বুঝলে ?

মুখে কিছু আর বলল না রুবি। মনে মনে নিজেকেই বলল—এখন তোর বাবা এখানে থাকলে বলতো—তরুণ-তরুণীদের এই মন নিয়ে একটা প্রোবিং রিপোর্ট করাতে হবে।

ঠিক এই সময় টেলিফোন বাজল।

কে ? বৌঠান ?

হ্যাঁ। আপনার বন্ধু তো বাড়ি নেই।

না হলেও চলবে। ফটো পছন্দ হয়েছে বাবার।

বলুন আপনারও পছন্দ হয়েছে মেয়ে—

এখন বলব না। তবে খুব কনজারভেটিভ।

একথা কেন বলছেন?

একদিন ওঁর অফিসে গিয়েছিলাম। অফিস ভাঙার মুখে। ভাবলাম—ভিড়। বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেব। তা লিফট নিলেন না। ভেবেছিলাম যেতে যেতে ওঁর মনটা জানবো।

ঠিকই তো করেছে।

কিন্তু বিয়ের পরে তো চাকরি করা চলবে না।

তখন আপনার বউ—আপনি যা ভালো বুঝবেন।

কিন্তু ওর বাবা-মাকে ও-ই তো দেখে—

তা একমাত্র মেয়ে—কে আর দেখবে?

তাঁদের খরচ-খরচা কে দেবে তখন?

রুবি বলল, আপনি এত টাকা আয় করেন। আপনি দিতে পারবেন না? আপনার শ্বশুর-শাশুড়িকে আপনি দেখবেন না?

তবু মাসে কত লাগে যদি জানতাম—

ফোনটা পাথর হয়ে কানের পাশে ঝুলে পড়ল রুবির। তখনো টুনু দত্ত বলে যাচ্ছিল মাসে মাসে আমার ইঞ্জিনীয়ার মিস্ত্রি বাবদে প্রায় লাখ টাকা মাইনে দিতে হয়। কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি বাবদে রেকারিং এক্স-পেন্সের আমার তো কোনো আন্দাজ নেই।

রুবি ঠাণ্ডা গলায় বলল, ফটোর কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যাবেন। ওদের আর কপি নেই বলছিল।

বানিয়ে বানিয়েই বলল রুবি। তার কানে তখন টুনু দত্তর কথাগুলো গলন্ত সিসে হয়ে ঢুকে যাচ্ছিল।

কিচ্ছু না বলে রুবি ফোনটা নামিয়ে রাখল।

ললি ছুটতে ছুটতে এসে বলল, মা বাইরে এসো। মণিদা গাড়ি

কিনেছে। দেখবে এসো।

তোর বাবা এসেছে ?

এসো না বাইরে। দেখে যাও।

মণি এই সময় ? বাইরে এসে রুবি দেখল রঙ্গলাল ফেরেনি। গাড়ি ফাঁকা। মণিই চালিয়ে এসেছে। আর তার পেছনে একখানা ট্যাক্সি। মিটার নেই। ভেতরে দুজন লোক বসে। হেড লাইটের জায়গা দুটোয় গর্ত।

মণি এক গাল হেসে বলল, কিনে ফেললাম বৌদি। সস্তায় পেলাম।

মিটার কোথায় ?

আগে রিপেয়ার করি। তারপর তো মিটার !

তোর দাদাবাবু কোথায় ?

আমায় তো দুপুরবেলা ছেড়ে দিয়ে বললেন, বাড়ি যাও। ফিরতে রাত হবে। যাক্‌গিয়ে ! এবার ট্যাক্সি চালাব। তারপর একদিন জি. টি. রোড দিয়ে ট্রাক নিয়ে পাঞ্জাবে যাবো।

বার বার তো আর রেস জিতবে না মণিদা !

রেস কেন ? ট্যাক্সির পয়সায় লরি কিনবো।

মলি ঠাট্টা করে বলল, আগে ট্যাক্সিটা রিপেয়ার করে নে।

মণি কি বলতে যাচ্ছিল। কুন্তির কথায় নেমে গেল। ললি তখন বলছিল, লালবাজারে তো তোমার নামে কেস ঝুলছে মণিদা। একথারও কোনো জবাব দিতে পারলো না মণি। আস্তে বলল, আমি তো কোর্ট থেকে বেল পেয়েছি ! এখন তো আমি খালাস হয়ে আছি।

কুন্তি ফুটপাথে এসে বলল, দাদাবাবুর অফিস থেকে ফোন।

রুবি ঘরে এসে ফোন ধরলো। হ্যালো—

প্রভাত থেকে বলছি। আপনি মিসেস সেন ?

হ্যাঁ। অফিস থেকে গাড়ি যাচ্ছে। আপনি বাড়ি আছেন তো ?

চমকে গেল রুবি। কেন ? আমাদের ড্রাইভার এখানে আছে। গাড়িও রয়েছে। কি ব্যাপার বলুন তো ? মিস্টার সেন নেই ওখানে ?

উনি কারনানি হাসপাতালে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি আসতে পারবেন ?

ঠাণ্ডা গলায় রুবি জানতে চাইলো, কেমন আছেন ?

জ্ঞান ফিরে আসবে শীগগির। ঢুকেই বাঁ হাতে। আট নম্বর বেড।

কুন্তি সব বুঝতে পারলো না। এইমাত্র বৌদি ললি মলিকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। ফুটপাথের ওপর মণির সত্ত কেনা গাড়িটা। গাড়ির গায়ের গন্ধ শুঁকে খুশি কুন্তির কাছে ফিরে এল।

কুন্তির মনে হচ্ছিল—এই গাড়িটাই অপয়া। অলুক্ষুণে গাড়ি। কোনো চোখ নেই। আলোর জায়গায় অন্ধকার গর্ত।

খুশি ত্থ-চারবার ফুটপাথ ঘেঁষে ঘাসের গন্ধ নিল। এখন সে বাড়ির ভেতর যাবে না। তার গায়ে ও-বাড়ির বড় মেয়েলোকটির রুবিয়া ভয়েলের জামা। চার পায়ের ফাঁকে পেট আর পিঠ ঢাকা পড়েছে। ওই মেয়েলোকটি রোজ আমায় খেতে দেয়। ও এখন ললি মলিকে নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে গেল। আমি এখন কুন্তির গা চাটবো। তাহলেই সে আমার সঙ্গে চোর চোর খেলবে!

কুন্তি কিন্তু চোর চোর খেললো না। সে ভেবেছিল, বৌদিদের সকাল সকাল খাইয়ে দিয়ে একবার চুয়ান্ন নম্বর বস্তিতে যাবে। ওখানে তাদের দেশের কানাই থাকে। এই সময় না গেলে কানাইকে ধরা যায় না। আজ তিন মাস হলো বারোটা টাকা হাওলাৎ করেছে কানাই তার কাছে। দেবার নাম নেই। দেখাও করে না। কাল ত্থপুরে গিয়ে কানাই-য়ের দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছে।

খুশি একা একা ফাঁকা বাড়িতে ঢুকলো। চার পায়ে ত্থলকি চালে সারা বারান্দায় পায়চারি করলো তিনবার। তারপর মলি-ললিদের ঘরে ঢুকে ওদের পড়ার টেবিল থেকে ডিকসনারিখানা নামিয়ে নিয়ে চিবোতে শুরু করলো।

চিবোতে চিবোতে খুশির মনে পড়লো—এ-বাড়িতে একজন খুব মোটা লম্বা লোক আছে। রোজ ত্থপুরে বেরোয়। ফেরে অনেক রাতে।

য়ে গান শোনে। মাঝে মাঝে মলিকে বকে। মন ভালো
় ডাক দেয়—খুশিবাবু! খেয়েছো? ঘুমিয়েছো?

মুখেই রঙ্গলালের কলিগরা সব বলল। চণ্ডীর ছবি ডেভলপ
য়ে গেছে। আর খানিক বাদেই ব্লক হয়ে পেজ ওয়ানে বসে
পাশে বৌদি—দাদার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথার ছবিও যাবে।
এই তরুণ রিপোর্টারের নাম জানে না রুবি। এখানে
া রঙ্গলালের অফিসের চেনা চার-পাঁচজনের জটলা চোখে
়। সে সব শুনে বলল, মাথায় রডের বাড়ি দিয়েছে?
তেও দিয়েছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে একটু আগে। এই তো
ব এসে দেখে চলে গেলেন এইমাত্র।
ওয়া যাবে ভেতরে?
।
ভিজিটার্স আওয়ার নয়। ফাঁকা হাসপাতালে লিফটটা থর
াতে কাঁপতে ওপরে উঠছিল।
রের করিডোর নির্জন।
র ললি তাদের মায়ের সঙ্গে হেঁটে পারছিল না। ললি ফিস্-
লকে বললো, কাল সকালের কাগজে বাবার ছবি উঠবে

। গলায় বলল, চুপ কর্। আমি যখন হিরোইন হবো—
ও উঠবে।
। তৈরি হাসপাতাল বাড়ি। উঁচু সিলিং। একখানা ফাঁকা
বৃদ্ধ বসে আছেন। দেখেই চিনতে পারলো রুবি। তার
একটু কমে গেল। আপনা-আপনি।
এখন হাসপাতালের খাটে বসে আছে? না শুয়ে আছে?
' না বোজানো? কি অবস্থায় যে দেখতে পাবে—রুবি তা
লে না।

॥ শেষ ॥